মানব শারীরতত্ত্ব : রক্ত ও সংবহন
HUMAN PHYSIOLOGY : BLOOD AND CIRCULATION

৪ অধ্যায়

মানবদেহে সার্বক্ষণিকভাবে বিভিন্ন ধরনের বিপাকীয় কর্মকাণ্ড সংঘটিত হয়। এসব বিপাকীয় কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন বস্তু, যেমন খাদ্য, অক্সিজেন, এনজাইম, হরমোন ইত্যাদি প্রতিনিয়ত কোষে সরবরাহ করা দরকার এবং সে সঙ্গে কোষে উৎপন্ন বিপাকজাত দূষিত পদার্থগুলোকে কোষ থেকে দূরীভূত করা দরকার। মানবদেহে এসব বস্তুর পরিবহন যে তন্ত্রের মাধ্যমে হয় তাকে সংবহনতন্ত্র বলে। মানুষের দেহে দুই ধরনের সংবহনতন্ত্র বিদ্যমান যথা– **রক্তসংবহনতন্ত্র** এবং **লসিকা সংবহনতন্ত্র**। প্রাণিদেহের রক্ত সংবহনতন্ত্র সম্পর্কে সর্বপ্রথম ধারণা দেন ব্রিটিশ বিজ্ঞানী **উইলিয়াম হার্ভে** (William Harvey, 1628)। এ অধ্যায়ে মানবদেহের রক্ত ও সংবহনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি আলোচনা করা হয়েছে।

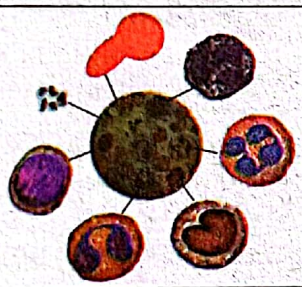
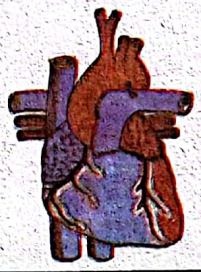
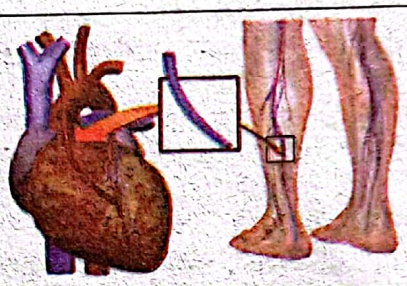

এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে শিক্ষার্থীরা যা যা শিখবে–

শিখনফল	বিষয়বস্তু (পিরিয়ড সংখ্যা-১৪)
১. রক্তকণিকা ও লসিকা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে। ২. রক্ত জমাট বাঁধার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. **ব্যবহারিক** ○ রক্তকণিকা শনাক্ত করতে পারবে এবং চিত্র অঙ্কন করতে পারবে। ৪. হৃৎপিণ্ডের গঠন বর্ণনা করতে পারবে। ৫. হার্টবিটের দশাসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৬. হার্টবিট নিয়ন্ত্রণে ব্যারোরিসিপ্টার (baro-receptors) এবং আয়তন রিসিপ্টারের (volume receptors) ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৭. মানবদেহের রক্ত সংবহন পদ্ধতির তুলনা করতে পারবে। ৯. হৃদরোগের বিভিন্ন অবস্থা ও করণীয় ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১০. হৃৎপিণ্ডের স্বাভাবিক রক্ত সঞ্চালনে পেসমেকারের কার্যক্রম ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১১. ওপেন হার্ট সার্জারি, করোনারি বাইপাস ও এনজিওপ্লাস্টের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।	● রক্ত ও লাসিকা ● রক্ত জমাট বাধা ● **ব্যবহারিক** ○ রক্ত কণিকাসমূহের স্থায়ী স্লাইড পর্যবেক্ষণ ● হৃৎপিণ্ডের গঠন ● হার্টবিট, বিভিন্ন দশা ও নিয়ন্ত্রণে SA নোড AB নোড এবং পারকিনজি আঁশের ভূমিকা ● রক্তচাপ ও ব্যারোরিসিপ্টার এবং আয়তন রিসিপ্টারের ভূমিকা ● মানবদেহের রক্তসংবহন তন্ত্র ○ সিষ্টেমিক সংবহন ○ পালমোনারী সংবহন ● হৃদরোগের বিভিন্ন অবস্থায় করণীয় ○ বুক ব্যাথা, ○ হার্ট এটাক ○ হার্ট ফেইলিউর ● হৃদরোগের চিকিৎসার ধারণা ○ পেসমেকার কার্যক্রম ○ ওপেন হার্ট সার্জারী ○ করোনারী বাইপাস ○ এনজিওপ্লাস্টি

৪.১ রক্ত (Blood)

রক্ত এক প্রকার বিশেষ ধরনের **তরল যোজক কলা**। রক্তের রং লাল। রক্ত ঈষৎ লবণাক্ত ও ক্ষারধর্মী। এর pH-এর মাত্রা ৭.৩৫-৭.৪৫ এবং তাপমাত্রা ৩৬-৩৮° সেলসিয়াস। রক্তের আপেক্ষিক গুরুত্ব প্রায় ১.০৫-১.০৬৫ (পানির চেয়ে বেশি)। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের দেহে গড়ে প্রায় ৫-৬ লিটার রক্ত থাকে, যা মানুষের মোট ওজনের প্রায় ৭-৮% কিন্তু রক্ত মোট কোষ-বহিঃস্থ তরলের ৩০-৩৫%। রক্তরস ও **রক্তকণিকা** নিয়ে রক্ত গঠিত। রক্তের ক্ষেত্রে **নিউটনের সান্দ্রতা সূত্র** (Newton's Law of Viscosity) প্রযোজ্য নয়।

CamScanner

রক্তের কাজ (Functions of Blood)

১। পুষ্টির বাহক : পরিপাক শেষে শোষিত খাদ্যরস ও ভিটামিন রক্তের মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন কোষে পরিবাহিত হয়ে পুষ্টি সাধন করে।

২। অক্সিজেন এবং কার্বন ডাইঅক্সাইডের বাহক : হিমোগ্লোবিনের সাহায্যে অক্সিহিমোগ্লোবিনরূপে দেহের বিভিন্ন কোষে O_2 পরিবহন করা যেমন রক্তের একটি কাজ, ঠিক তেমনি দেহের বিভিন্ন কোষে শ্বাসকার্যের ফলে উদ্ভূত CO_2 রক্তের মাধ্যমেই পরিবাহিত হয়ে ফুসফুস থেকে দূরীভূত হয়ে থাকে।

৩। হরমোন, এনজাইম, ভিটামিন ও অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থের বাহক : অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি নিঃসৃত হরমোন, এনজাইম, ভিটামিন এবং অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ উৎপত্তিস্থল থেকে কর্মস্থলে রক্তের মাধ্যমে পরিবাহিত হয়।

৪। বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন : বিপাকীয় কার্যের ফলে উদ্ভূত CO_2, ইউরিয়া প্রভৃতি উৎপন্ন বিভিন্ন জৈব পদার্থ, অজৈব রাসায়নিক রস, এনজাইম এবং অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ উৎপত্তিস্থল থেকে রক্তই রেচন অঙ্গে নিয়ে যায়।

৫। রক্তপাত নিরোধক : রক্ত তঞ্চন বা রক্ত জমাট বেঁধে রক্তপাত বন্ধ করা রক্তের উপাদান অনুচক্রিকার একটি অনবদ্য ভূমিকা।

৬। অম্ল ও ক্ষারকত্বের ভারসাম্য রক্ষা : বিভিন্ন ফসফেট ও কার্বনেট যৌগের সাহায্যে রক্ত দেহের বিভিন্ন কলার অম্লত্ব ও ক্ষারত্ব নিয়ন্ত্রণ করে।

৭। সঞ্চয় অঙ্গ থেকে খাদ্য পরিবাহক : রক্তের মাধ্যমে প্রয়োজনবোধে সঞ্চয় অঙ্গ থেকে খাদ্য দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পরিবাহিত হয়ে থাকে।

৮। পানি সমতা নিয়ন্ত্রণ : রক্ত দেহের কোষে এবং বিভিন্ন তরল অংশে পানি সরবরাহ করে। আবার দেহে পানির পরিমাণ বেড়ে গেলে অতিরিক্ত পানিকে বৃক্কে প্রেরণ করে। এইভাবে রক্ত দেহে পানির সাম্যতা বজায় রাখে।

৯। আয়নের সমতা রক্ষা : রক্ত দেহের কোষ এবং তার চারদিকে অবস্থিত রক্তের মধ্যে আয়নের সমতা বজায় রাখে।

১০। হোমিওস্ট্যাসিস রক্ষা : রক্ত দেহের অভ্যন্তরীণ পরিবেশের ভারসাম্য (হোমিওস্ট্যাসিস) রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১১। উষ্ণতার সমতা রক্ষক : সমোষ্ণশোণিত (homeothermal) প্রাণীদের পেশি, যকৃৎ প্রভৃতি বিভিন্ন অঙ্গে তাপ উৎপন্ন হয়। এই তাপ রক্তের মাধ্যমে পুরো দেহে ছড়িয়ে দৈহিক উষ্ণতা রক্ষা করে। আবার কোনো কারণে দৈহিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে রক্ত অতি দ্রুতগতিতে দেহের পরিধির অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা স্থানে সঞ্চালিত হয় এবং বাষ্পীভবনের মাধ্যমে অতিরিক্ত তাপ নির্গত হয়ে যায়; এভাবে রক্ত দৈহিক উষ্ণতার সমতা রক্ষা করে।

১২। ইমিউনিটি এবং আত্মরক্ষামূলক : দেহ প্রোটিন ছাড়া অন্য কোনো প্রোটিন রক্তে প্রবেশ করলে যে পদার্থের সৃষ্টি হয় তাই অ্যান্টিবডি। এই অ্যান্টিবডি বাইরের জীবাণু বা প্রোটিন কণাগুলোকে নিষ্ক্রিয় রেখে দেহে প্রবিষ্ট ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া বা অন্য জীবাণুদের গ্রাস করে ধ্বংস করে।

❑ **কাজ :** ক্ষতস্থান থেকে গড়িয়ে পড়া লাল তরল পদার্থের কাজ লেখ।

রক্তের উপাদান

রক্ত টেস্টটিউবে নিয়ে সেন্ট্রিফিউগাল যন্ত্রে মিনিটে ৩০০০ বার করে ৩০ বার ঘুরালে রক্ত দুটি স্তরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। উপরের হাল্কা হলুদ বর্ণের প্রায় ৫৫% অংশ **রক্তরস** বা **প্লাজমা** (plasma) এবং নিচের গাঢ়তর বাকি ৪৫% অংশ **রক্তকণিকা** (blood corpuscles)। লোহিত কণিকার আধিক্যের কারণে রক্ত লাল দেখায়। স্বাভাবিক অবস্থায় রক্তকণিকাগুলো রক্তরসে ভাসমান থাকে।

রক্তের উপাদানের ছক (Elements of Blood)

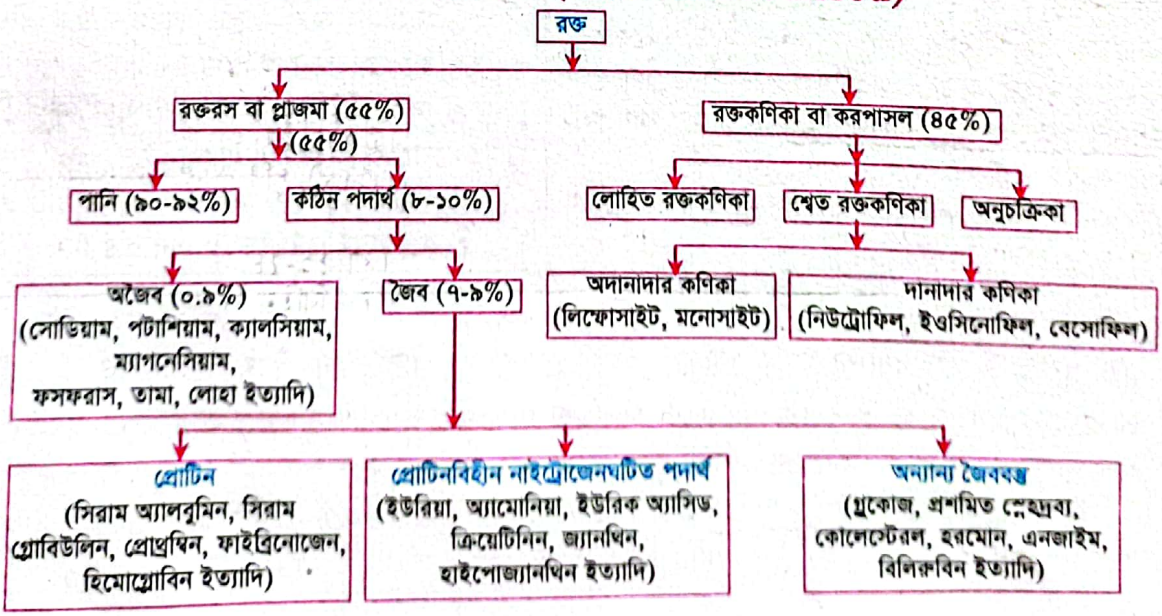

CamScanner

(ক) রক্তরস বা প্লাজমা (Plasma)

রক্তের ঈষৎ ক্ষারধর্মী অকোষীয় হালকা হলুদ বর্ণের স্বচ্ছ তরল অংশকে **রক্তরস** বা **প্লাজমা** বলে। রক্তরসে রক্তকণিকাগুলো ভাসমান অবস্থায় থাকে। এতে বিলিরুবিন, ক্যারোটিন, জ্যান্থোফিল প্রভৃতি কণা থাকায় প্লাজমা হালকা হলুদ বর্ণের দেখায়। রক্তরসের pH ৭.৪। রক্তের ৫৫% হলো রক্তরস। এর ৯০-৯২% পানি এবং ৮-১০% কঠিন পদার্থ। কঠিন পদার্থ বিভিন্ন **জৈব** (৭-৯%) ও **অজৈব** (০.৯%) উপাদান নিয়ে গঠিত। রক্তরসে সামান্য গ্যাসীয় বস্তুও পাওয়া যায়। একজন পূর্ণবয়স্ক সুস্থ মানুষের দেহে প্রায় ৩ লিটার রক্তরস থাকে যা দেহের ওজনের ৫%। রক্তরসের প্রধান উপাদানগুলো হচ্ছে : (১) পুষ্টিদ্রব্য বা খাদ্যসার : গ্লুকোজ, অ্যামিনো এসিড, স্নেহপদার্থ (ফ্যাটি এসিড, ফসফোলিপিড, কোলেস্টেরল, লেসিথিন), নিউক্লিওটাইড ইত্যাদি; (২) প্লাজমা প্রোটিন (জৈব পদার্থের মধ্যে প্রায় ৭.৫%) : অ্যালবুমিন, গ্লোবিউলিন, ফাইব্রিনোজেন, প্রোথ্রম্বিন ইত্যাদি; (৩) বিভিন্ন ধরনের আয়ন: Na^+, K^+, Ca^{++}, Mg^{++}, Fe^{++}, Mn^{++}, Zn^{++}, Cl^-, SO_4^{2-}, PO_4^{3-}, HCO_3^-, HPO_4^- ইত্যাদি; (৪) গ্যাসীয় পদার্থ : O_2, CO_2, N_2 ইত্যাদি; (৫) রেচন পদার্থ : ইউরিয়া, ইউরিক এসিড, ক্রিয়েটিনিন ইত্যাদি; (৬) প্রতিরক্ষামূলক উপাদান : ইমিউনোগ্লোবিউলিন, লাইসোজাইম, প্রোপারডিন (properdin), অ্যান্টিটক্সিন, অ্যাগ্লুটিনিন (অ্যান্টিবডি) প্রভৃতি এবং (৭) অন্যান্য উপাদান : হেপারিন, বিভিন্ন হরমোন, এনজাইম, ভিটামিন, বিলিরুবিন ও বিলিভার্ডিন নামে রঞ্জক পদার্থ ইত্যাদি।

বিভিন্ন কলায় রক্তরসের উপাদানের কিছুটা ভিন্নতা দেখা যায় যা যকৃৎ ও বৃক্ক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। একটি বিশেষ ধরনের দ্রবণ **সিমুলেটেড বডি ফ্লুইড** (Simulated body fluid-SBF) যার আয়নিক উপাদান অনেকটা রক্তরসের মতো।

রক্তরসের কাজ : (১) খাদ্যসার নিঃসৃত পদার্থ, রেচন পদার্থ, হরমোন, এনজাইম, লিপিড প্রভৃতি রাসায়নিক দ্রব্য বিভিন্ন অঙ্গে পরিবহন করে। (২) টিস্যু থেকে বর্জ্য পদার্থ রেচনের জন্য বৃক্কে পরিবহন করে। (৩) CO_2 রক্তরসে বাইকার্বনেটরূপে দ্রবীভূত থাকে। (৪) সামান্য পরিমাণ O_2 এতে বাহিত হয়। (৫) রক্তের অম্ল-ক্ষারের ভারসাম্য রক্ষা করে। (৬) দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। (৭) রক্তকণিকাসমূহ ধারণ করে এবং রক্তের তারল্য রক্ষা করে। (৮) দেহের প্রোটিন আধার হিসেবে কাজ করে। (৯) রক্তের প্লাজমা প্রোটিনের সাহায্যে অভিস্রবণ চাপ রক্ষা করে। (১০) রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে। (১১) রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে। (১২) রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে।

(খ) রক্তকণিকা (Blood Corpuscles)

রক্তরসে ভাসমান আণুবীক্ষণিক কোষগুলোকে রক্তকণিকা বলে। এগুলো হিমাটোপয়েসিস (Hemotopoiesis) প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন হয়। এদের কোষ না বলে কণিকা বলা হয় কারণ এরা অন্যান্য কোষের মতো স্ববিভাজিত হয়ে সৃষ্টি হয় না। রক্তে তিন ধরনের কণিকা বিদ্যমান, যথা : **লোহিত রক্তকণিকা** বা **এরিথ্রোসাইট** (Red Blood Corpuscles -RBC or Erythrocytes), **শ্বেত রক্তকণিকা** বা **লিউকোসাইট** (White Blood Corpuscles-WBC or Leucocytes) এবং **অনুচক্রিকা** বা **থ্রম্বোসাইট** বা **প্লেটলেট** (Thrombocyte or Blood Platelets)। রক্তকণিকাগুলো নির্দিষ্ট আকৃতিবিশিষ্ট হওয়ায় এবং আদর্শ প্রাণিকোষের ন্যায় বিভিন্ন কোষীয় অঙ্গাণু (মাইটোকন্ড্রিয়া, এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম, গলগি বস্তু, সেন্ট্রিওল ইত্যাদি) না থাকায় এদের **সাকার উপাদানও** (formed elements) বলা হয়। এগুলো সাধারণত লাল অস্থিমজ্জায় (red bone marrow) সৃষ্টি হয় এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর ধ্বংস হয়।

১। লোহিত রক্তকণিকা বা এরিথ্রোসাইট (Erythrocytes; Gr. *erythros* = red + *kytos* = cell)

রক্তরসে বিদ্যমান হিমোগ্লোবিন শ্বাসরঞ্জকযুক্ত শ্বাসবায়ু (O_2 বা CO_2) পরিবহণে সক্ষম লালবর্ণের রক্তকণিকাকে **লোহিত রক্তকণিকা** বা **এরিথ্রোসাইট** বা **হিমাটিড** বলে। পরিণত লোহিত রক্তকণিকা নিউক্লিয়াসবিহীন, দ্বিঅবতল ও গোলাকার চাকতির মতো। নিউক্লিয়াস না থাকার ফলে এটি স্বল্প আয়ুর হয় এবং লোহিত রক্তকণিকার ম্যাট্রিক্সে অনেক বেশি পরিমাণ হিমোগ্লোবিন থাকে। ফলে O_2 পরিবহন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এতে RNA, গলজি বস্তু এবং মাইটোকন্ড্রিয়াও থাকে না। এরা স্থিতিস্থাপক প্লাজমা পর্দাবিশিষ্ট স্পঞ্জি সাইটোপ্লাজম দ্বারা গঠিত। এর কিণারা মসৃণ, গোলাকার ও পুরু এবং কেন্দ্রভাগ পাতলা। এদের ব্যাস 7.3 μm এবং পুরুত্ব 2.2 μm। লোহিত রক্তকণিকা অত্যন্ত নমনীয় ও স্থিতিস্থাপক হওয়ায় সরু ও ক্ষুদ্র রক্তবাহের অভ্যন্তরে প্রবাহের সময় গঠন ঠিক থাকে না। সংযুক্তির ক্ষমতা বেশি থাকায় লম্বা, বক্র এবং শাখান্বিত স্তম্ভের মতো জমা হয়ে রোঁলো (rouleaux) সৃষ্টি করে। **স্তন্যপায়ীদের মধ্যে উটের RBC-তে নিউক্লিয়াস থাকে।**

একজন প্রাপ্তবয়স্ক **পুরুষের রক্তে** প্রতি ঘন মিলিমিটারে ৫.০-৫.৪ মিলিয়ন বা ৫০-৫৪ লাখ, **নারীর দেহে** ৪৫-৪৮ লাখ, **শিশুর দেহে** ৬০-৭০ লাখ এবং **ভ্রূণের দেহে** ৮০-৯০ লাখ RBC বিদ্যমান। বিভিন্ন শারীরিক অবস্থায় (যেমন– ব্যায়াম, গর্ভাবস্থায় ইত্যাদি) এ সংখ্যার তারতম্য ঘটে। আয়তনের দিক দিয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় পুরুষের রক্তে লোহিত রক্তকণিকা ৪৫% এবং মহিলাদের ৪০%। লোহিত রক্তকণিকার সাইটোপ্লাজমে **হিমোগ্লোবিন** (hemoglobin) নামক লৌহঘটিত শ্বাসরঞ্জক থাকে। এ কারণে রক্ত লাল বর্ণের দেখায়। **মানুষের প্রতিটি লোহিত রক্তকণিকায় প্রায় ২৭০-২৮০ মিলিয়ন হিমোগ্লোবিন অণু থাকে।** হিমোগ্লোবিন **হিম** (heme) নামক লৌহ ধারণকারী **রঞ্জক** (pigment) এবং **গ্লোবিন** (globin) নামক প্রোটিনের সমন্বয়ে গঠিত। এক অণু হিমোগ্লোবিন চারটি হিম একক ও চারটি পেপটাইড শৃঙ্খল দ্বারা গঠিত। সুস্থ দেহে প্রতি ১০০ মিলিলিটার রক্তে প্রায় ১৫-১৬ গ্রাম হিমোগ্লোবিন থাকে। রক্তে লোহিত রক্তকণিকার আয়তন পরিমাপের শতকরা হিসাবকে **হেমাটোক্রিট** (hematocrit; Ht or HCT) বলে।

CamScanner

শরীরে হিমোগ্লোবিনের অভাব হলে (অর্থাৎ প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে লোহিত কণিকার সংখ্যা ৫০ লাখের চেয়ে ২৫% কম হলে) রক্তশূন্যতা বা **রক্তস্বল্পতা** বা **অ্যানিমিয়া** (anaemia) দেখা দেয়। অ্যানিমিয়াতে লোহিত রক্তকণিকার সংখ্যা হ্রাস পায় এবং রক্তের এই অবস্থাকে **অলিগোসাইথেমিয়া** (oligocythemia) বলে। আবার কলেরা, উদরাময় প্রভৃতি ক্ষেত্রে লোহিত রক্তকণিকার সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে (অর্থাৎ প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে লোহিত কণিকার সংখ্যা ৬৫ লাখের বেশি হলে) একে **পলিসাইথেমিয়া** (polycythemia) বলে।

ভ্রূণীয় জীবনে কুসুম থলি (৩ সপ্তাহ বয়সে) যকৃৎ, প্লিহা ও থাইমাস (৬ মাস বয়স পর্যন্ত) থেকে উৎপন্ন হয়। পরবর্তীতে রক্তকণিকাগুলো অস্থিমজ্জার **স্টেম কোষ** (stem cell) বা **হিমোসাইটোব্লাস্ট** (haemocytoblast) কোষ থেকে উৎপন্ন হয়। লোহিত কণিকা সৃষ্টিকে **এরিথ্রোপোয়েসিস** (erythropoesis) বলে। লোহিত রক্তকণিকা প্রায় ১২০ দিন বা ৪ মাস জীবিত থাকে। এরা এই সময়কালে বার বার কৈশিকনালির প্রাচীর ভেদসহ প্রায় ১১০০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে। এরা যকৃৎ ও প্লিহাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। (ম্যাক্রোফেজ কোষের অবস্থানের কারণে) এজন্য যকৃৎ ও প্লিহাকে RBC-এর **কবরস্থান** (graveyard of RBC) বলা হয়। লোহিত রক্তকণিকা ধ্বংসের পর এর অধিকাংশ হিমোগ্লোবিনের লৌহঘটিত অংশ **ফেরিটিন** হিসেবে যকৃতে জমা হয়, যা পরবর্তী সময় RBC তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। হিমোগ্লোবিনের বাকি অংশ **বিলিভার্ডিনে** রূপান্তরিত হয়, যা পরে **বিলিরুবিনে** পরিণত হয়। মানবদেহে প্রতি সেকেন্ডে ২০ লাখের বেশি (প্রায় ১ কোটি) লোহিত কণিকা ধ্বংস হয় এবং সমসংখ্যায় তৈরি হয়। বৃক্কের গ্লোমেরুলাস থেকে উৎপন্ন **এরিথ্রোপোয়েটিন** (erythropoietin) নামক হরমোন লাল অস্থিমজ্জার থেকে RBC তৈরি নিয়ন্ত্রণ করে। **মানবদেহে লোহিত রক্তকণিকা প্রতি মিনিটে একবার সমগ্র দেহ পরিভ্রমণ করে।**

রাসায়নিক উপাদানের মধ্যে রয়েছে পানি : ৬০-৭০%, কঠিন পদার্থ : ৩০% (কঠিন পদার্থের প্রায় ৯০% হিমোগ্লোবিন) এবং অবশিষ্ট ১০% প্রোটিন, ফসফোলিপিড, কোলেস্টেরল, অজৈব লবণ, অজৈব ফসফেট, পটাশিয়াম ইত্যাদি।

লোহিত রক্তকণিকা কাজ : (১) লোহিত রক্তকণিকার হিমোগ্লোবিন **অক্সিহিমোগ্লোবিন** যৌগরূপে ফুসফুস থেকে দেহের সকল কোষে O_2 পরিবহন করে। (২) হিমোগ্লোবিন কোষ নির্গত CO_2-এর একাংশকে **কার্বামিনো যৌগরূপে** পরিবহন করে ফুসফুসে নিয়ে আসে। (৩) রক্তের ঘনত্ব ও সান্দ্রতা (viscocity) রক্ষা করে। (৪) এগুলোর হিমোগ্লোবিন ও অন্যান্য অন্তঃকোষীয় বস্তু বাফাররূপে রক্তে অম্ল-ক্ষারের সাম্য রক্ষা করে। (৫) প্লাজমামেমব্রেনে অ্যান্টিজেন সংযুক্ত থাকে, যা মানুষের রক্ত গ্রুপিংয়ের জন্য দায়ী। (৬) রক্তে বিভিন্ন রঞ্জকের উৎস হিসেবে **বিলিরুবিন** ও **বিলিভার্ডিন** উৎপন্ন করে। (৭) এরা **হাইড্রোজেন সালফাইড** গ্যাস উৎপাদন করতে পারে যা রক্তনালির সঙ্কোচনের জন্য সংকেত প্রদান করে। (৮) দেহের অনাক্রম্যতায় সাড়া প্রদান করে এবং এনজাইমরূপী নাইট্রিক অক্সাইড উৎপাদন করতে পারে।

২। শ্বেত রক্তকণিকা বা লিউকোসাইট (Leucocytes; Gr. *leucos* = colourless + *kytos* = cell)

রক্তরসে বিদ্যমান যেসব কণিকা নিউক্লিয়াসযুক্ত, বর্ণহীন, দানাদার বা অদানাদার, অনিয়তাকার ও অপেক্ষাকৃত বৃহৎ এবং দেহের প্রতিরক্ষায় বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে তাদের **শ্বেত রক্তকণিকা** বা **লিউকোসাইট** বলে। এরা হিমোগ্লোবিনবিহীন, স্বচ্ছ, এবং লোহিত রক্তকণিকার তুলনায় বৃহৎ। শ্বেত রক্তকণিকার আকৃতি এবং গঠন পরিবর্তনশীল। প্রতিটি কোষের নিউক্লিয়াস প্রাথমিক অবস্থায় গোল বা ডিম্বাকার হয় কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৃক্কাকার বা অশ্বক্ষুরের আকৃতি বিশিষ্ট হয়। এর নিউক্লিয়াস সাইটোপ্লাজমের চাপে এক প্রান্তে অবস্থান করে। গড় ব্যাস আকৃতির বিভিন্নতা অনুসারে ৭.৫-২০μm।

রক্তে এদের পরিমাণ খুব কম। প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে ৫-৮ হাজার শ্বেত রক্তকণিকা থাকে। শিশু ও অসুস্থ মানবদেহে এদের সংখ্যা বেড়ে যায়। লোহিত রক্তকণিকা ও শ্বেত রক্তকণিকার অনুপাত ৭০০ : ১ (বা ৬০০ : ১)। শ্বেত রক্তকণিকা আয়তনের দিক দিয়ে পরিণত সুস্থ মানুষের রক্তের মাত্র ১%। এদের আয়ুকাল প্রায় ১-১৫ দিন। এরা অস্থিমজ্জার **হিমাটোপয়টিক মাতৃকোষ** (hematopoietic stem cell) থেকে **মায়েলোপয়সিস** (myelopoiesis) প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি হয়। এছাড়া প্লিহা ও লসিকাগ্রন্থি থেকেও উৎপন্ন হয়। এগুলো **ফ্যাগোসাইটোসিস** প্রক্রিয়ায় জীবাণু ধ্বংস করে। এরা অ্যামিবয়েড চলন প্রদর্শন করে এবং রক্তবাহের প্রাচীর ভেদ করে বাইরে যেতে পারে

রক্তে শ্বেতকণিকার সংখ্যা স্বাভাবিক অপেক্ষা অধিক থাকলে তাকে **লিউকোসাইথিমিয়া** বা **লিউকোসাইটোসিস** (leukocythemia/leukocytosis) এবং কম থাকলে তাকে **লিউকোপিনিয়া** (leukopenia) বলে। শ্বেতকণিকার সংখ্যা অস্বাভাবিক হারে বেড়ে গেলে **লিউকোমিয়া** (leukamia) ক্যান্সারের সৃষ্টি হয় কিন্তু এসময় লোহিত কণিকা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং রোগীর মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কিছু শ্বেত রক্তকণিকা রক্ত থেকে স্থানান্তরিত হয়ে দেহের অন্য কোন কলায় স্থায়ীভাবে অবস্থান করে। যকৃতে বিদ্যমান **কুপার কোষ** (Kupffer cells) নামক শ্বেত রক্তকণিকা অনাক্রম্যতন্ত্রের অংশ হিসেবে কাজ করে।

এ কণিকাগুলো নিউক্লিওপ্রোটিন, গ্লাইকোজেন, লিপিড, কোলেস্টেরল, অ্যাসকরবিক এসিড ও বিভিন্ন ধরনের প্রোটিওলাইটিক এনজাইম বহন করে। এদেরকে দেহের **ভ্রাম্যমাণ প্রতিরক্ষাকারী একক** (mobile defensive units) বলা হয়।

CamScanner

শ্বেত রক্তকণিকার প্রকারভেদ (Classification of WBC)

কোষের আকৃতি, নিউক্লিয়াসের গঠন প্রকৃতি ও সাইটোপ্লাজমে দানার উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির উপর ভিত্তি করে শ্বেত রক্তকণিকা প্রধানত দু'প্রকার, যথা– **গ্র্যানিউলোসাইট** (granulocyte) বা **দানাদার শ্বেত রক্তকণিকা** এবং **অ্যাগ্রানিউলোসাইট**(agronulocyte) বা **অদানাদার শ্বেত রক্তকণিকা**।

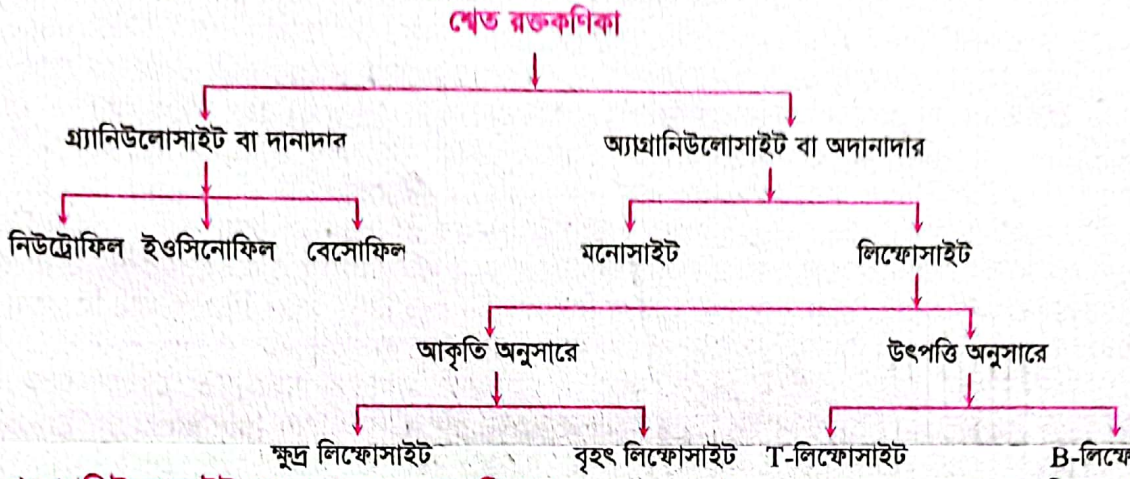

(ক) গ্র্যানিউলোসাইট বা দানাদার শ্বেতকণিকা (Granulocyte) : এ ধরনের শ্বেত রক্তকণিকার সাইটোপ্লাজমে দানাদার, নিউক্লিয়াস ছোট ও খণ্ডায়িত (২-৭টি) এবং লোবযুক্ত। এদের ব্যাস ৮-১৫μm (কারও মতে ১২-১৫μm)। এরা সম্পূর্ণরূপে অস্থিমজ্জার **মায়োলোব্লাস্ট** (myeloblast) নামক কোষ থেকে উৎপন্ন হয়। শ্বেতকনিকার ৭২% হচ্ছে গ্র্যানিউলোসাইট। লিশম্যান (Leishman) বা ইওসিন রঞ্জকে দানাগুলো বিভিন্নভাবে রঞ্জিত হয়। রঞ্জক ধারণ ক্ষমতা এবং নিউক্লিয়াসের গঠনের ভিত্তিতে গ্র্যানিউলোসাইটগুলো আবার তিন প্রকার। যথা :

(i) নিউট্রোফিল (Neutrophil) : এরা মোট শ্বেতকণিকার প্রায় ৭০% অর্থাৎ প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে এদের সংখ্যা ৩-৬ হাজার। এদের নিউক্লিয়াস ২-৭ খণ্ডকবিশিষ্ট এবং এর সাইটোপ্লাজম **বর্ণ-নিরপেক্ষ** দানাযুক্ত, যেগুলো ইওসিন রঞ্জকে বেগুনি বর্ণ ধারণ করে। এরা ক্ষুদ্র সক্রিয় ফ্যাগোসাইট। যার জন্য এদেরকে কখনো **মাইক্রোফাজ** (microphage) বলা হয়। মৃত অণুজীব এবং নিউট্রোফিল একত্রে **পুঁজ** গঠন করে। এদের জীবনকাল ২-৪ দিন।

কাজ : নিউট্রোফিল ফ্যাগোসাইটোসিস পদ্ধতিতে অণুজীব, বিশেষ করে ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসের মাধ্যমে দেহকে রোগজীবাণু থেকে রক্ষা করে। রক্তবাহিকার বাইরে acute inflammation সৃষ্টি করে। এরা ডায়াপেডেসিস (ma) প্রক্রিয়ায় জীবাণু ধ্বংস করতে পারে (১০ম অধ্যায়ে বিস্তারিত)।

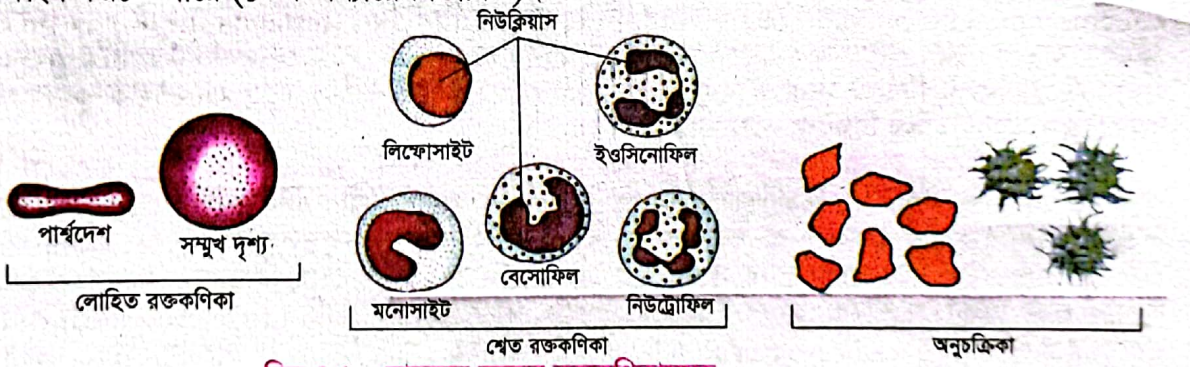

চিত্র ৪.১ : মানুষের রক্তের রক্তকণিকাসমূহ

(ii) ইওসিনোফিল (Eosinophil) : মোট শ্বেতকণিকার প্রায় ১.৫-৫% অর্থাৎ প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে এদের সংখ্যা ১০০-৪০০। নিউক্লিয়াস ২-৩ খণ্ডকবিশিষ্ট এবং অম্লাসক্ত দানাগুলো ইওসিন রঞ্জকে **লাল বর্ণ** ধারণ করে। এদের জীবনকাল ৮-১২ দিন। এগুলো রক্তবাহিকা অপেক্ষা পৌষ্টিকনালিতে অধিক পাওয়া যায়। পরজীবীর সংক্রমণ, অ্যালার্জি, প্লিহা ও স্নায়ুতন্ত্রের রোগের কারণে রক্তে ইওসিনোফিলের সংখ্যা বেড়ে যায়।

কাজ : এরা হিস্টামিন নিঃসরণ করে রক্তে প্রবেশকৃত কৃমির লার্ভা এবং অ্যালার্জি প্রতিরোধ করে। এছাড়াও অনাক্রম্যতা ও হাইপারসেনসিটিভিটিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

(iii) বেসোফিল (Basophil) : মোট শ্বেতকণিকার প্রায় ০.৫% অর্থাৎ প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে এদের সংখ্যা ২৫-২০০টি। নিউক্লিয়াস খণ্ডকবিশিষ্ট এবং ক্ষারাসক্ত দানাগুলো ইওসিন রঞ্জকে **নীল বর্ণ** ধারণ করে। এদের জীবনকাল ১২-১৫ দিন। এরা **হেপারিন** (heparin) ও **হিস্টামিন** (histamin) নামক দুই ধরনের রাসায়নিক পদার্থ নিঃসরণ করে।

কাজ : এই কোষ নিঃসৃত **হিস্টামিন** দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে এবং **হেপারিন** প্রোটিন তৈরি করে, যা রক্তনালির অভ্যন্তরে রক্ত জমাট বাঁধতে বাধা প্রদান করে।

CamScanner

(খ) অ্যাগ্র্যানিউলোসাইট বা অদানাদার (Agranuloecyte) : এদের সাইটোপ্লাজমে কোনো দানা থাকে না। নিউক্লিয়াস স্বচ্ছ ও বৃহৎ এবং অখণ্ডায়িত। এদের উৎপত্তি লসিকা গ্রন্থি, প্লিহা, থাইমাস ও ক্ষুদ্রান্ত্রের লসিকা টিস্যু থেকে। শ্বেত রক্তকনিকার ২৮% হচ্ছে অ্যাগ্র্যানিউলোসাইট। দুই ধরনের অ্যাগ্র্যানিউলোসাইট দেখা যায়। যথা : **লিম্ফোসাইট** (lymphocyte) ও **মনোসাইট** (monocyte)।

(i) লিম্ফোসাইট (Lymphocyte) : এরা মোট শ্বেত রক্তকণিকার ২৪%-২৫% অর্থাৎ প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে এদের সংখ্যা প্রায় ১৫০০-২৭০০। এরা গোলাকার, সাইটোপ্লাজম স্বল্প ও ক্ষারীয় এবং নিউক্লিয়াস বৃহৎ ও গোলাকার। আকৃতি অনুসারে এদের দু'ভাগে ভাগ করা হয়, যথা– (১) **ছোট লিম্ফোসাইট** : এদের ব্যাস ৭-৮μm; নিউক্লিয়াস বৃহৎ ও গোলাকার যা কোষের অধিকাংশ স্থানজুড়ে অবস্থান করে এবং (২) **বৃহৎ লিম্ফোসাইট** : এদের ব্যাস ১০-১৪μm; নিউক্লিয়াস গোলাকার বা বৃক্কাকার; সাইটোপ্লাজম কোষের অধিকাংশ স্থানজুড়ে অবস্থান করে। আবার উৎপত্তি অনুসারেও লিম্ফোসাইটকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়, যথা– (১) **T-লিম্ফোসাইট** বা T-cell : এরা থাইমাস গ্রন্থি থেকে পরিণতি লাভ করে লসিকাগ্রন্থিতে অবস্থান করে। এরা কোষভিত্তিক অনাক্রম্যতা রক্ষা করে। (২) **B-লিম্ফোসাইট** বা B- cell : এরা অস্থিমজ্জা থেকে উৎপন্ন হয় এবং পরিণতি লাভ করে লসিকাগ্রন্থিতে অবস্থান করে। এরা অ্যান্টিবডি উৎপাদন দ্বারা রসভিত্তিক অনাক্রম্যতা রক্ষা করে। অধিকাংশ লিম্ফোসাইট **দেহ টিস্যু** অর্থাৎ বিশেষ করে লিম্ফনোড, প্লিহা, অ্যাডেনয়েড এবং পরিপাকনালির লিম্ফয়েড টিস্যুতে পাওয়া যায়। এরা ফ্যাগোসাইট নয়।

কাজ : T- লিম্ফোসাইট কিছু অণুজীব ধ্বংস করে, তবে এরা প্রধানত সংক্রমিত দেহকোষকে আক্রমণ করে।এছাড়াও বিকৃত (defectiva) লিম্ফোসাইট দেহে ক্যান্সার বা আটাইমিউন ব্যাধির (autoimmune disease) সৃষ্টি করতে পারে। B-লিম্ফোসাইট অ্যান্টিবডি তৈরি করে এবং ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসকে দেহে প্রবেশের পূর্বে আক্রমণ করে। এ ধরনের লিম্ফোসাইটগুলো অ্যান্টিবডি সৃষ্টি করে রোগ প্রতিরোধ করে।

(ii) মনোসাইট (Monocyte) : এদের নিউক্লিয়াস অপেক্ষাকৃত ছোট, ডিম্বাকার ও বৃক্কাকার এবং সাইটোপ্লাজম বেশি, স্বচ্ছ ও দানাহীন। এরা বৃহৎ আকৃতির শ্বেত রক্তকণিকা। এদের ব্যাস ১০μm-২০μm। এরা **চলমান ফ্যাগোসাইট** (mobile phagocyte)। অস্থিমজ্জার মনোব্লাস্ট ((monoblast) কোষ থেকে উৎপন্ন হয়ে রক্তে মাত্র ৩০-৪০ ঘণ্টা থাকার পর এরা **ম্যাক্রোফাজে** (macrophage) পরিণত হয়। এরা অস্থিমজ্জায় বৃদ্ধি লাভ করে এবং রক্তস্রোতে প্রবেশ করে। এদের সংখ্যা প্রায় ২৮০-৮০০।

কাজ : ফ্যাগোসাইটোসিস পদ্ধতিতে এরা রোগজীবাণু ধ্বংস করে এবং টিস্যুর মৃতকোষ ভক্ষণ করে। সাধারণভাবে এদের **'rubbish collecting'** কোষ বলে। এরা কতিপয় অ্যান্টিজেনকে কাজে লাগিয়ে ইমিউনতন্ত্রে ভূমিকা পালন করে।

শ্বেত রক্তকণিকার কাজ : (১) লিউকোসাইট দেহরক্ষাকারী অতন্দ্র প্রহরী ও বিশ্বস্ত সৈনিক। (২) মনোসাইট ও নিউট্রোফিল **ফ্যাগোসাইটোসিস** (phagocytosis) পদ্ধতিতে জীবাণুকে বিনষ্ট করে এবং দেহকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করে। (৩) লিম্ফোসাইটগুলো **অ্যান্টিবডি** সৃষ্টি করে রোগ প্রতিরোধ করে, এজন্য এদের **আণুবীক্ষণিক সৈনিক** (microscopic soldier) বলে। (৪) দানাদার লিউকোসাইট **হিস্টামিন** (histamine) সৃষ্টি করে দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। (৫) বেসোফিল **হেপারিন** (heparine) তৈরি করে, যা রক্তনালির অভ্যন্তরে রক্তজমাট রোধ করে। (৬) নিউট্রোফিলের বিষাক্ত দানা জীবাণু ধ্বংস করে। (৭) ইউসিনোফিল রক্তে প্রবেশকৃত কৃমির লার্ভা এবং দেহের **অ্যালার্জিক-অ্যান্টিবডির** বিরুদ্ধে কাজ করে।

৩। অনুচক্রিকা বা থ্রম্বোসাইট বা প্লেটলেট (Thrombocyte or Blood Platelets) রক্তরসে বিদ্যমান বর্ণহীন, ক্ষুদ্র, ডিম্বাকার বা দণ্ডাকার, নিউক্লিয়াসবিহীন ও রক্তজমাটে সাহায্যকারী কণিকাগুলোকে **অনুচক্রিকা বা থ্রম্বোসাইট** বলে। এগুলো গোলাকার বা ডিম্বাকার বা দণ্ডাকার ও নিউক্লিয়াসবিহীন। এরা **ক্ষুদ্রতম রক্তকণিকা**। এদের ব্যাস প্রায় ২-৫μm। প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে প্লেটলেটের সংখ্যা ২.৫ লাখ - ৫ লাখ। অসুস্থ দেহে এগুলোর সংখ্যা আরও বেশি হয়। রক্তে অনুচক্রিকার সংখ্যা স্বাভাবিক অপেক্ষা অধিক থাকলে তাকে **থ্রম্বোসাইটোসিস** (thrombocytosis) এবং কম থাকলে তাকে **থ্রম্বোসাইটোপিনিয়া** (thrombocytopenia) বলে। এদের দানাময় সাইটোপ্লাজমে পিনোসাইটিক গহ্বর, সংকোচী গহ্বর, বিভিন্ন কোষীয় অঙ্গাণু (যেমন– মাইটোকন্ড্রিয়া, গলগি বস্তু, লাইসোজোম, রাইবোজোম প্রভৃতি), গ্লাইকোজেন দানা, অ্যাকটিন, মায়োসিন, শ্বসন এনজাইম, অন্তঃকোষজালক ইত্যাদি থাকে। এতে প্রোটিন ও প্রচুর পরিমাণ **সেফালিন** (cephalin) নামক ফসফোলিপিড থাকে। এগুলো লাল অস্থিমজ্জার ম্যাগাক্যারিওসাইট (megakaryocyte) কোষ থেকে উৎপন্ন হয়। অনেকের মতে, শ্বেত রক্তকণিকা থেকেও থ্রম্বোসাইটের সৃষ্টি হয়। এদের আয়ুকাল প্রায় ৫-১০ দিন। এরা যকৃৎ ও প্লিহা এবং অন্যান্য রেটিকিউলো-এন্ডোথেলিয়াল (Reticulo-endothelial-RE) কোষে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এরা সহজেই ভেঙ্গে যায় এবং রক্ত তঞ্চনের জন্য প্রয়োজনীয় **থ্রম্বোকাইনেজ** (thrombokinase) এনজাইম সৃষ্টি করে।

অনুচক্রিকার কাজ : (১) শরীরে কোনো ক্ষতস্থান থেকে রক্তপাত হলে অনুচক্রিকা **হিমোস্ট্যাটিক প্লাগ** (hemostatic plug = blood platelets + plasma proteins) গঠন করে রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে, ফলে রক্তপাত বন্ধ হয়। (২) রক্তজালিকার অন্তঃআবরণীর পর্দার গায়ে এঁটে গিয়ে মেরামতের কাজ দ্রুততর করে। (৩) **সেরোটোনিন** বা 5-HT (serotonin or 5-hydroxytryptamine) নামক একটি রাসায়নিক বস্তু উৎপন্ন করে, যার মাধ্যমে রক্তনালির সংকোচন ঘটে। (৪) ফ্যাগোসাইটোসিস পদ্ধতিতে কার্বনকণা, ইমিউন কমপ্লেক্স, ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসকে ভক্ষণ করে। (৫) এরা কিছু অ্যান্টিজেনিক বস্তুও ধারণ করে। (৬) প্রয়োজন শেষে রক্তজমাট বিগলনে সাহায্য করে। (৭) দেহের কোথাও ব্যথার সৃষ্টি হলে রাসায়নিক পদার্থ ক্ষরণ করে নিউট্রোফিল ও মনোসাইটকে আকৃষ্ট করে থাকে।

CamScanner

মানবদেহের রক্তের বিভিন্ন রক্তকণিকার সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নরূপ

রক্তকণিকা	প্রকারভেদ	সংখ্যা (প্রতি ঘন মিমি রক্তে)	উৎসস্থল	গঠন বৈশিষ্ট্য	কাজ	আয়ুষ্কাল (জীবনকাল)
লোহিত রক্তকণিকা	-	৫০ লাখ	ভ্রূণাবস্থায় যকৃৎ ও প্লিহা এবং জন্মের পর লাল অস্থিমজ্জা।	গোলাকার, দ্বি-অবতল, পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় নিউক্লিয়াসবিহীন; গড় ব্যাস ৭.৩ μm ও স্থূলতা ২.২ μm.	O_2 ও CO_2 বহন করে। অম্ল ও ক্ষারের সমতা রক্ষা করে।	১২০ দিন
শ্বেত রক্তকণিকা	নিউট্রোফিল	৩-৬ হাজার	লাল অস্থিমজ্জা	সাইটোপ্লাজম দানাযুক্ত, নিউক্লিয়াস ২-৭ খণ্ডবিশিষ্ট। ব্যাস ১০μm -১৪μm.	ফ্যাগোসাইটোসিস পদ্ধতিতে জীবাণু ধ্বংস করে।	২-৪ দিন
	ইওসিনোফিল	১০০-৪০০	লাল অস্থিমজ্জা	সাইটোপ্লাজম দানাযুক্ত, নিউক্লিয়াস ২-৩ খণ্ডবিশিষ্ট। ব্যাস ১০μm -১২μm.	হিস্টামিন ক্ষরণ করে অ্যালার্জি প্রতিরোধে সাহায্য করে।	৮-১২ দিন
	বেসোফিল	২৫-২০০	লাল অস্থিমজ্জা	দানাযুক্ত সাইটোপ্লাজম, নিউক্লিয়াস বৃক্কাকার, খণ্ডক বিশিষ্ট ব্যাস ৮μm - ১০μm.	হেপারিন নিঃসরণ করে রক্ত জমাট বাঁধতে বাধা দেয়।	১২-১৫ দিন
	লিম্ফোসাইট	১৫০০-২৭০০	প্লিহা, লসিকা গ্রন্থি, যকৃৎ, লাল অস্থিমজ্জা।	দানাবিহীন সাইটোপ্লাজম, প্রায় গোলাকার, বৃহদাকার নিউক্লিয়াস। ব্যাস ৭μm -১৪μm.	অ্যান্টিবডি উৎপন্ন করে।	সপ্তাহ থেকে সমগ্র জীবনব্যাপী
	মনোসাইট	৩৫০-৮০০	প্লিহা, লসিকা গ্রন্থি, যকৃৎ, লাল অস্থিমজ্জা।	দানাবিহীন সাইটোপ্লাজম, বৃক্কাকার নিউক্লিয়াস। ব্যাস ১০μm -২০μm.	ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় জীবাণু ধ্বংস করে।	২-৪ দিন
অনুচক্রিকা	-	২.৫ লাখ-৫ লাখ	লাল অস্থিমজ্জা।	গোল, ডিম্বাকার বা রডের মতো, দানাময় কিন্তু নিউক্লিয়াসবিহীন। ব্যাস ২μm -৫μm.	রক্ততঞ্চনে সহায়তা করে।	৫-১০ দিন

লোহিত রক্তকণিকা, শ্বেত রক্তকণিকা ও অনুচক্রিকার মধ্যে তুলনা

তুলনীয় বিষয়	লোহিত কণিকা	শ্বেত রক্তকণিকা	অনুচক্রিকা
১। সংখ্যা (প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে)	প্রায় ৫০ লাখ।	৫-৮ হাজার।	২.৫ লাখ - ৫ লাখ।
২। নিউক্লিয়াস	প্রাথমিকভাবে নিউক্লিয়াস থাকলেও পরিণত অবস্থায় নিউক্লিয়াসবিহীন।	নিউক্লিয়াসযুক্ত।	নিউক্লিয়াসবিহীন।
৩। সাইটোপ্লাজম	দানাবিহীন।	দানাযুক্ত।	দানাযুক্ত।
৪। হিমোগ্লোবিন	উপস্থিত।	থাকে না।	থাকে না।
৫। বর্ণ	লাল বর্ণের।	বর্ণহীন।	বর্ণহীন।
৬। আকার	গোলাকার ও দ্বি-অবতল।	গোলাকার বা অনিয়তাকার।	গোলাকার বা ডিম্বাকার বা অনিয়তাকার।
৭। গড় আয়ু	১২০ দিন।	১-১৫ দিন।	৫-১০ দিন।
৮। প্রকারভেদ	নেই।	এরা পাঁচ প্রকার। যথা– নিউট্রোফিল, ইওসিনোফিল, বেসোফিল, লিম্ফোসাইট ও মনোসাইট।	নেই।
৯। কাজ	O_2 ও CO_2 পরিবহন করা।	রোগজীবাণু ধ্বংস ও রোগাক্রমণ প্রতিরোধ করা।	রক্ত তঞ্চন করা।

CamScanner

[প্রাসঙ্গিক তথ্য : রক্তের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের স্বাভাবিক মান

হিমোগ্লোবিন : 13 – 15 gm/dl (গড় 14.5 gm); শর্করা : PP (Post Parandial) 80 – 120 mg/dl; Fasting 70 – 110 mg/dl

সিরাম কোলেস্টেরল : 100 – 150 mg/dl;সিরাম ইউরিয়া : 15 – 40 mg/dl;সিরাম বিলিরুবিন : 0.2 – 1.0 mg/dl

ESR (Erythrocyte Sedimentation Rate) : প্রথম ঘণ্টায় 5 mm এবং দ্বিতীয় ঘণ্টায় 10 mm হয়।

BT (Bleeding Time) : 2 – 5 মিনিট; CT (Clotting Time) : 2 – 8 মিনিট ;dl = Decilitre

রক্তের কয়েকটি অস্বাভাবিক অবস্থা

পলিসাইথিমিয়া : লোহিত কণিকার সংখ্যা স্বাভাবিক অপেক্ষা অধিক বৃদ্ধি পাওয়া। কলেরা, উদরাময় ইত্যাদি রোগে লোহিত কণিকার সংখ্যা বেড়ে যায়। এটি মুখ্য ও গৌণ হতে পারে।

অলিগোসাইথিমিয়া : রক্তে লোহিত কণিকার সংখ্যা স্বাভাবিক অপেক্ষা অধিক কমে যাওয়া। অ্যানিমিয়া রোগে লোহিত কণিকার সংখ্যা কমে যায়।

অ্যানিমিয়া : শরীরে হিমোগ্লোবিনের অভাব হলে রক্তশূন্যতা বা অ্যানিমিয়া দেখা দেয়।

থ্যালাসেমিয়া : হিমোগ্লোবিন সংশ্লেষের ত্রুটিজনিত এক ধরনের বংশগত রোগ, যেক্ষেত্রে হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া হয়।

লিউকোসাইথিমিয়া বা লিউকোসাইটোসিস : রক্তে শ্বেতকণিকার সংখ্যা স্বাভাবিক অপেক্ষা অধিক বেড়ে যাওয়া। নিউমোনিয়া, হুপিংকাশি ইত্যাদি রোগে শ্বেতকণিকার সংখ্যা বেড়ে যায়।

লিউকোমিয়া : যখন শ্বেতকণিকার সংখ্যা অত্যধিক হারে বেড়ে যায় (প্রতি মাইক্রোলিটারে ৫০,০০০ - ১,০০০,০০০)। যেমন– ব্লাড ক্যান্সার।

লিউকোপিনিয়া : রক্তে শ্বেতকণিকার সংখ্যা যখন স্বাভাবিক অপেক্ষা অধিক কমে যায়।

থ্রম্বোসাইটোসিস : রক্তে অনুচক্রিকার পরিমাণ স্বাভাবিক অপেক্ষা বৃদ্ধি পাওয়া।

থ্রম্বোসাইটেপিনিয়া : রক্তে অনুচক্রিকার পরিমাণ স্বাভাবিক অপেক্ষা কমে যাওয়া।

পেরিকার্ডাইটিস : হৃৎপিণ্ডের ঝিল্লির প্রদাহ; বুকে তীব্র ব্যথা ও কাশি।

BT এবং CT : রক্তক্ষরণ শুরু থেকে রক্ত তঞ্চিত হওয়ার সময়কালকে তঞ্চনকাল বা CT (Clotting time) বলে। অপরপক্ষে, রক্তক্ষরণ শুরু হওয়া থেকে রক্তক্ষরণ বন্ধ হওয়া পর্যন্ত সময়কালকে রক্ত মোক্ষণকাল বা BT (Bleeding time) বলে।

রক্ততঞ্চন বা রক্ত জমাট বাঁধা (Blood Clotting)

দেহের কোনো স্থান কেটে গেলে বা আঘাতের কারণে ক্ষতস্থানের মাধ্যমে রক্তপাত হলে রক্তে উপস্থিত বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য দ্বারা ক্ষতস্থানের রক্ত জমাট বাঁধে। ফলে রক্তপাত বন্ধ হয়ে যায়। **যে প্রক্রিয়ায় কোনো ক্ষতের মুখে রক্ত জমাট বেঁধে দেহ থেকে অবাঞ্ছিত রক্তপাত বন্ধ হয় তাকে রক্ততঞ্চন বা রক্ত জমাট বাঁধা বলে।** রক্ততঞ্চনে **অনুচক্রিকা** ও **ফাইব্রিনোজেন** সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। দ্রবণীয় ফাইব্রিনোজেন অদ্রবণীয় ফাইব্রিন জালকে রূপান্তরিত হওয়ার ফলে এতে রক্তকণিকাসমূহ আবদ্ধ হওয়ার জন্য রক্ত তরলতা হারিয়ে জেলিতে পরিণত হয়ে ক্ষতস্থান বন্ধ করে। সমগ্র রক্ততঞ্চন প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত জটিল এবং **১৩টি রক্ততঞ্চন ফ্যাক্টর** বা **ক্লটিং ফ্যাক্টর** (coagulation factors or clotting factor) সমন্বিত কার্যের দ্বারা সংঘটিত হয়। এগুলোর মধ্যে প্রোথ্রম্বিন, ফাইব্রিনোজেন, থ্রম্বোপ্লাস্টিন ও Ca++ -এ ৪টি ফ্যাক্টর গুরুত্বপূর্ণ। এ ফ্যাক্টরগুলো রক্তরস ও রক্তকণিকায় বিদ্যমান থাকে।

রক্ততঞ্চন ফ্যাক্টরগুলোর নাম এবং রক্ততঞ্চনে এদের ভূমিকার ছক

ফ্যাক্টর	তঞ্চনে ভূমিকা
১। Factor I বা ফাইব্রিনোজেন (Fibrinogen)	এটি গ্লোবিউলিন জাতীয় প্রোটিন। তঞ্চনের সময় **ফাইব্রিনে** পরিণত হয়।
২। Factor II বা প্রোথ্রম্বিন (Prothrombin)	এটি প্লাজমা প্রোটিন। ভিটামিন K-র উপস্থিতিতে যকৃতে সংশ্লেষিত হয়। তঞ্চনের সময় **থ্রম্বিনে** পরিণত হয়।
৩। Factor III বা থ্রম্বোপ্লাস্টিন (Thromboplastin)	এটি বিনষ্ট কলাকোষ বা ভাঙা অনুচক্রিকা থেকে নিঃসৃত হয়। এটি ক্যালসিয়াম আয়নের সহায়তায় **প্রোথ্রম্বিনকে থ্রম্বিনে** পরিণত করে।
৪। Factor IV বা ক্যালসিয়াম আয়ন (Calcium ion)	ক্যালসিয়াম আয়ন একাধারে থ্রম্বোপ্লাস্টিন উৎপাদনে সাহায্য করে এবং অন্যদিকে প্রোথম্বিনকে **থ্রম্বিনে** পরিণত করে।
৫। Factor V বা ল্যাবাইল ফ্যাক্টর বা প্রোঅ্যাকসেলারিন (Proaccelerin)	প্লাজমায় অবস্থিত প্রোটিন জাতীয় এ পদার্থটি **প্রোথ্রম্বিনকে থ্রম্বিনে** পরিণত করে।

CamScanner

ফ্যাক্টর	তঞ্চনে ভূমিকা
৬। Factor VI বা অ্যাকসেলারিন (Accelerin)	এটি প্রকল্পিত (অর্থাৎ Does not exist)।
৭। Factor VII বা স্টেবল ফ্যাক্টর বা প্রোকনভারটিন (Proconvertin)	প্লাজমায় অবস্থিত এই প্রোটিনটি **থ্রম্বোপ্লাস্টিন** উৎপাদনে সাহায্য করে।
৮। Factor VIII বা অ্যান্টিহিমোফিলিক ফ্যাক্টর (AHF)/Antihaemophilic factor A	এটি প্লাজমায় থাকে এবং **থ্রম্বোপ্লাস্টিন** সৃষ্টিতে সাহায্য করে।
৯। Factor IX বা ক্রিস্টমাস (Chrismas) ফ্যাক্টর	এটি প্লাজমায় থাকে এবং থ্রম্বোপ্লাস্টিন উৎপাদনে সাহায্য করে।
১০। Factor X বা স্টুয়ার্ট ফ্যাক্টর/Antihaemophilic factor B	এর রাসায়নিক উপাদান ফ্যাক্টর VII-এর মতো। এর অভাবে **রক্ততঞ্চন** ব্যাহত হয়।
১১। Factor XI বা প্লাজমা থ্রম্বোপ্লাস্টিন অ্যান্টিসিডেন্ট (PTA)/Antihaemophilic factor C	রক্তরসে অবস্থিত প্রোটিন **থ্রম্বোপ্লাস্টিন** গঠনে অংশ নেয়।
১২। Factor XII বা হ্যাগমান (Hageman) ফ্যাক্টর	রক্তরসে অবস্থিত এই ফ্যাক্টর **ক্যালিক্রেইনকে** (kallikrein) সক্রিয় করে এবং **প্লাজমাকাইনিন** (plasmakinin) নামক পদার্থ সৃষ্টি করে রক্তনালির ভেদ্যতা ও সম্প্রসারণশীলতা বাড়ায়।
১৩। Factor XIII বা ফাইব্রিন স্টেবিলাইজিং (Fibrin stabilizing) ফ্যাক্টর	এটি ক্যালসিয়াম আয়নের সহযোগিতায় রক্তের নরম তঞ্চন পিণ্ডকে অদ্রবণীয় কঠিন তন্তুতে রূপান্তরিত করে।

রক্ততঞ্চন বা রক্ত জমাট বাঁধার কৌশল

১। দেহের কোনো স্থান কেটে ক্ষতস্থান থেকে নির্গত রক্ত বায়ুর সংস্পর্শে আসে এবং ক্ষতস্থানের অনুচক্রিকা বা থ্রম্বোসাইট ভাঙনের ফলে **থ্রম্বোপ্লাস্টিন** নামক এনজাইমে পরিণত হয়।

২। থ্রম্বোপ্লাস্টিন রক্তের **হেপারিনকে** অকেজো করে দেয় এবং রক্তরসে অবস্থিত ক্যালসিয়াম আয়নের (Ca^{2+}) উপস্থিতিতে নিষ্ক্রিয় **প্রোথ্রোম্বিন** নামক গ্লাইকোপ্রোটিনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে সক্রিয় **থ্রোম্বিন** এনজাইম উৎপন্ন করে।

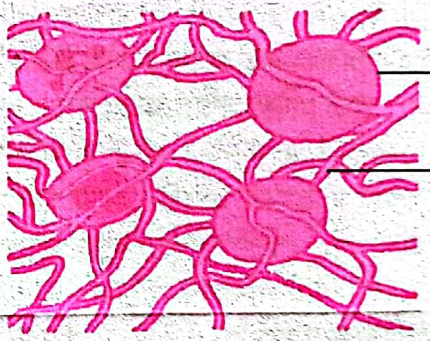

চিত্র ৪.২ : ফাইব্রিন জালকে রক্তকণিকা আবদ্ধ

৩। থ্রোম্বিন রক্তে অবস্থিত দ্রবণীয় প্লাজমাপ্রোটিন **ফাইব্রিনোজেনকে** প্রথমে অদ্রবণীয় **ফাইব্রিন মনোমার** বা **হিমোস্ট্যাটিক প্ল্যাগ** ও পরে **ফাইব্রিন পলিমার** এবং **ফাইব্রিন জালক** সৃষ্টি করে।

৪। ফাইব্রিন জালকে রক্তকণিকা আটকা পড়ে রক্ত জমাট বেঁধে যায়। ফলে রক্তপাত বন্ধ হয়। **মানুষে রক্ত জমাট বাঁধার স্বাভাবিক সময় ৪-৫ মিনিট।**

সংক্ষেপে রক্ততঞ্চন কৌশলের পর্যায়ক্রমিক ধাপ :

১. বিনষ্ট কলা ও বিমুক্ত রক্তের থ্রম্বোসাইট বাতাসের সংস্পর্শে এসে

২. থ্রম্বোসাইট ⟶ থ্রম্বোপ্লাস্টিন

৩. থ্রম্বোপ্লাস্টিন + প্রোথ্রোম্বিন ⟶ (প্লাজমা এনজাইম (ফ্যাক্টর VII, VIII, IX, X) ও Ca^{2+}) থ্রোম্বিন

৪. থ্রোম্বিন + ফাইব্রিনোজেন ⟶ ফাইব্রিন মনোমার

৫. ফাইব্রিন মনোমার (অনেকগুলো) ⟶ ফাইব্রিন পলিমার ⟶ ফাইব্রিন জালক

৬. ফাইব্রিন জালক + আবদ্ধ লোহিত ও শ্বেত রক্তকণিকা ⟶ রক্ততঞ্চন

তঞ্চন ফ্যাক্টরের অনুপস্থিতি কিংবা স্বল্প মাত্রায় উপস্থিতির কারণে তঞ্চন প্রক্রিয়া ব্যাহত হতে পারে। যেমন : তঞ্চন ফ্যাক্টর VIII বা ফ্যাক্টর IX-এর অনুপস্থিতির কারণে থ্রম্বোপ্লাস্টিন অকার্যকর থেকে **হিমোফিলিয়া** (haemophilia) রোগের সৃষ্টি করে। **রক্ত জমাট বাঁধার পর খড় (straw) রং সদৃশ যে তরল পৃথক হয় তাকে সিরাম (serum) বলে।** সিরাম বস্তুতপক্ষে রক্তরস, তবে এতে ফাইব্রিনোজেন ও তঞ্চন ফ্যাক্টর II, V ও VIII থাকে না এবং এতে অধিক সেরোটোনিন থাকে। **সেরোটোনিন** রক্তনালির সংকোচন ঘটিয়ে রক্তপাত হ্রাস করে। রক্ত সিরাম নিয়ে অধ্যয়নের বিষয়কে **সেরোলজি** (serology) বলা হয়। রক্তরসে **হেপারিন** (heparin)-এর উপস্থিতির কারণে রক্তনালির অভ্যন্তরে রক্ত জমাট বাঁধে না। হেপারিন প্রোথ্রোম্বিনকে থ্রোম্বিনে ও ফাইব্রিনোজেনকে ফাইব্রিনে পরিবর্তন প্রতিহত করে।

CamScanner

স্বাভাবিক অবস্থায় রক্তনালিতে রক্তজমাট না বাঁধার কারণ–

১। দেহে রক্ত প্রচণ্ড গতিতে অবিরাম প্রবহমান থাকার ফলে।

২। রক্তনালীর এন্ডোথেলিয়াম প্রাচীর অত্যন্ত মসৃণ থাকায়।

৩। রক্তের মধ্যে অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট ফ্যাক্টর হেপারিন থাকায়।

৪। সক্রিয় কোয়াগুলেন্ট ফ্যাক্টরগুলোকে যকৃৎ কর্তৃক সর্বদা অপসারিত হওয়ায়।

৫। মানুষের রক্ত ও অন্যান্য কলাতে প্রায় ৫০ ধরনের উপাদান বা ফ্যাক্টর আছে যেগুলো রক্ততঞ্চন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। এদেরকে দুই ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়, যথা– (ক) **প্রোকোয়াগুলেন্ট ফ্যাক্টর–** এরা রক্ততঞ্চনকে উদ্দীপিত করে এবং (খ) **অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট ফ্যাক্টর–** এরা রক্ততঞ্চনকে প্রতিরোধ করে। রক্ততঞ্চন নির্ভর করে দেহে প্রোকোয়াগুলেন্ট ও অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট উপাদানসমূহের ভারসাম্যের উপর। স্বাভাবিক অবস্থায় অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট প্রোকোয়াগুলেন্টের উপর প্রকট। ফলে রক্তনালির অভ্যন্তরে রক্ত জমাট বাঁধে না।

❑ **কাজ :** (i) হাত সামান্য কেটে গেলে রক্তক্ষরণের এক পর্যায়ে রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে যায়– প্রক্রিয়াটির শারীরতত্ত্ব ব্যাখ্যা দাও। (ii) হাত কেটে গেলে বিশেষ তরল পদার্থ বের হওয়া বন্ধ হয় কিভাবে তা ব্যাখ্যা কর। (iii) রক্ত জমাট বাঁধার কৌশল ব্যাখ্যা কর।

৪.২ লসিকা বা লিম্ফ (Lymph)

প্রধানত কৈশিক জালিকার ভেদ্য প্রাচীরের মাধ্যমে রক্তের যে তরল অংশ বের হয়ে শিরা ও ধমনির জালকের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করে দেহের প্রতিটি কোষকে সিক্ত রাখে তাকে **লসিকা** বলে। অন্যভাবে বলা যেতে পারে, যে **স্বচ্ছ, ঈষৎ হলুদ বা বর্ণহীন, ক্ষারধর্মী পরিবর্তিত কলারস বা টিস্যুরস** (tissue fluid) **যা কলাকোষে পুষ্টিদ্রব্য সরবরাহ করে এবং দেহের প্রতিরক্ষামূলক কাজে অংশগ্রহণ করে তাকে লসিকা বা লিম্ফ বলে**। লসিকা রক্তের ন্যায় এক প্রকার যোজক কলাবিশেষ। এরা **বহিঃকোষীয় তরল** নামে পরিচিত। লসিকা সাধারণত **লসিকা জালক** (lymph capillaries), **লসিকাবাহ** (lymphatics) ও **লসিকা গ্রন্থি** বা **লসিকা-গণ্ডে** (lymph glands or lymph nodes) অবস্থান করে। প্রকৃতপক্ষে এ লসিকার মাধ্যমেই প্রতিটি কোষে খাদ্যরস ও অক্সিজেন পৌঁছায় এবং অপ্রয়োজনীয় CO_2 ও বর্জ্য পদার্থ লসিকায় গৃহীত হয়ে দেহ থেকে নির্গত হয়ে থাকে। প্রসঙ্গত রক্ত ও লসিকার মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী তরলকে **লসিকারস** বলে। মানবদেহে লসিকার পরিমাণ প্রায় রক্তের দ্বিগুণ অর্থাৎ ১০-১২ লিটার। দেহ কোষের চারপাশে বিদ্যমান **ইন্টারস্টেশিয়াল তরল** (interstitial fluid) (প্রায় ১০% রক্তরস থেকে লসিকা সৃষ্টি হয়। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় লসিকা সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে **লিম্ফোজেনেসিস** (lymphogenesis) বলা হয়।

লসিকার উপাদান :

লসিকায় প্রধানত দুধরনের উপাদান দেখা যায়, যথা- কোষ উপাদান ও কোষবিহীন উপাদান।

কোষ উপাদান : লসিকায় প্রধানত শ্বেত কণিকার লিম্ফোসাইট থাকে। সামান্য পরিমাণ লোহিত কণিকা দেখা গেলেও (কৈশিক জালিকার পাতলা প্রাচীর ভেদ করে ইন্টারস্টিশিয়াল তরলে প্রবেশ করে) অনুচক্রিকা সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত। প্রতি কিউবিক মিলিমিটার লসিকায় ৫০০-৭৫,০০০ লিম্ফোসাইট থাকতে পারে।

কোষবিহীন উপাদান : লসিকায় অবস্থিত কোষবিহীন উপাদানগুলো রক্তরসের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। লসিকায় প্রায় ৯৪%ই পানি এবং ৬% কঠিন পদার্থ বিদ্যমান। কঠিন অংশের মধ্যে নিম্নোক্ত উপাদানগুলো পাওয়া যায় :

১. শর্করা : প্রতি ১০০ মিলিমিটার লসিকায় শর্করার (গ্লুকোজ) পরিমাণ ১২০-১৩২ গ্রাম।

২. প্রোটিন : লসিকায় প্রধানত অ্যালবুমিন, গ্লোবিউলিন, ফাইব্রিনোজেন, এনজাইম, অ্যান্টিবডি ইত্যাদি থাকে।

৩. লিপিড : প্রধানত কাইলোমাইক্রন হিসেবে থাকে যাতে ট্রাইগ্লিসারাইড ও ফসফোলিপিড উপস্থিত। অভুক্ত অবস্থায় লসিকায় ফ্যাটের পরিমাণ কম থাকেঃ। চর্বিযুক্ত খাবার খেলে লসিকায় ফ্যাটের পরিমাণ বেড়ে যায় এবং লসিকা দুধের মতো সাদা দেখায়। এ ধরনের লসিকাকে কাইল (chyle) বলে। তবে সাধারণত এবং পরিমাণ মোট কঠিন অংশের প্রায় ৫-১৫%।

৪. রেচন বর্জ্য : লসিকায় ইউরিয়া, ইউরিক এসিড, ক্রিয়োটিনিন ইত্যাদি পাওয়া যায়।

৫. অন্যান্য বস্তু : গ্লুকোজ, জীবাণু, ক্যানসার কোষ, দ্রবীভূত (CO_2) ইত্যাদিও লসিকায় পাওয়া যায়।

CamScanner

লসিকার গুরুত্ব বা কাজ (Importance of lymph)

১। লসিকার মাধ্যমে প্রতিটি কোষে খাদ্যরস ও O_2 পৌছায়।

২। আন্তঃকোষীয় উন্মুক্ত স্থান থেকে অধিকাংশ প্রোটিন লসিকার মাধ্যমে রক্তে ফিরে আসে।

৩। যেসব লিপিড কণা রক্তের কৈশিক জালিকার মধ্য দিয়ে পরিবাহিত হতে পারে না, সেগুলো লসিকার মাধ্যমে পরিবাহিত হয়।

৪। অপ্রয়োজনীয় CO_2 এবং বর্জ্য পদার্থ লসিকায় গৃহীত হয়ে দেহ থেকে নির্গত হয়।

৫। ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিলাইয়ের ল্যাকটিয়েলের মাধ্যমে চর্বিজাতীয় খাদ্য শোষিত হয় এবং লসিকানালির লসিকার সাহায্যে রক্তস্রোতে প্রেরিত হয়।

৬। দেহের যেসব স্থানে রক্ত পৌছাতে পারে না, সেসব অঞ্চলে লসিকা রক্ত থেকে খাদ্যবস্তু, অক্সিজেন, হরমোন ও ভিটামিন সরবরাহ করে। লসিকা দেহে একটি **মধ্যস্থতাকারী** (mediator) তরল হিসেবে কাজ করে।

৭। লসিকা দেহরক্ষার কাজ করে এবং ইমিউনিটি বৃদ্ধি করে।

৮। লসিকা মধ্যস্থ শ্বেতকণিকা (লিম্ফোসাইট) জীবাণু ধ্বংস করে এবং অ্যান্টিবডি উৎপাদন করে দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলে।

৯। বিভিন্ন অঙ্গে টিস্যুর গাঠনিক অখণ্ডতা রক্ষায় বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

১০। কলারসের এক-দশমাংশ লসিকার মাধ্যমে অপসারিত হয়। লসিকানালির মধ্যে কোনো কারণে লসিকা প্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হলে সে স্থানে লসিকা পুঞ্জীভূত হয় এবং ফুলে ওঠে। একে **শোথ** বা **ইডিমা** (edema) বলে।

১১। লসিকা Antigen-presenting cell (APCs) পরিবহন করে লসিকা গ্রন্থিতে নিয়ে যায় যেখানে অনাক্রম্যতা সাড়াদানের সূচনা ঘটে।

মানুষের রক্ত ও লসিকা-এর মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	রক্ত	লসিকা
১। বর্ণ	লাল বর্ণের।	বর্ণহীন বা হালকা হলুদ।
২। গঠন উপাদান	রক্তরস, লোহিত কণিকা, শ্বেতকণিকা এবং অনুচক্রিকা থাকে।	রক্তরস ও কেবল লিম্ফোসাইট নামক শ্বেতকণিকা থাকে।
৩। হিমোগ্লোবিন	উপস্থিত।	অনুপস্থিত।
৪। ফাইব্রিনোজেন	রক্তে অধিক পরিমাণে থাকে।	লসিকায় কম পরিমাণে থাকে।
৫। পরিবহন	রক্তবাহের মাধ্যমে সংবাহিত হয়।	লসিকাবাহের মাধ্যমে সংবাহিত হয়।
৬। যোগাযোগ	রক্তের সাথে কলাকোষের সরাসরি যোগাযোগ থাকে না।	লসিকার সাথে কলাকোষের সরাসরি যোগাযোগ থাকে।
৭। প্রোটিন	লসিকা অপেক্ষা বেশি।	রক্ত অপেক্ষা অনেক কম।
৮। কাজ	রক্তের মাধ্যমে শ্বসন গ্যাস ও খাদ্যকণা (শর্করা ও আমিষ) পরিবাহিত হয়।	লসিকার মাধ্যমে বর্জ্য পদার্থ ও খাদ্যসার (লিপিড) পরিবাহিত হয়।

লসিকা সংবহনতন্ত্র (Lymphatic System)

যে তন্ত্রের মাধ্যমে সমগ্র দেহে লসিকা বা লিম্ফ প্রবাহিত হয় তাকে **লসিকা সংবহনতন্ত্র** বলে। ডেনিস বিজ্ঞানী **Olaus, Rudbeck** এবং **Thomas Bartholin** (1760) সর্বপ্রথম মানুষের লসিকা সংবহনতন্ত্রের বর্ণনা দেন। মানুষের তথা প্রাণীদের লসিকা সংবহনতন্ত্র **লসিকা, লসিকা জালক, লসিকানালি** এবং **লসিকাগ্রন্থি** নিয়ে গঠিত।

১। **লসিকা (Lymph) :** লসিকা একপ্রকারের পরিবর্তিত কলারস। রক্তজালক থেকে উৎপন্ন হয়ে কোষান্তর স্থানে সঞ্চিত হয়। এর উপাদান রক্তের মতো, তবে এতে লোহিত কণিকা, অনুচক্রিকা এবং রক্তে প্রাপ্ত অধিকাংশ প্রোটিন অনুপস্থিত। অনেকে মনে করেন, কিছু অনুচক্রিকাও উপস্থিত থাকতে দেখা যায়।

২। **লসিকা জালক (Lymph capillaries) :** রক্তজালক থেকে উৎপন্ন লসিকা প্রথমে কোষান্তর স্থানে এসে জমা হয়। কোষান্তর স্থানের চারদিকে লসিকা জালক থাকে। লসিকা এই জালকে প্রবেশ করে এবং লসিকাবাহে আসে। লসিকা জালকের প্রাচীর কেবল এন্ডোথেলিয়াম পরিবেষ্টিত থাকে।

CamScanner

৩। লসিকাবাহ বা লসিকানালি (Lymphatic vessels) : লসিকা জালকগুলো মিলিত হয়ে লসিকাবাহ বা লসিকানালি গঠন করে। যে বিশেষ ধরনের নালিকার মাধ্যমে লসিকা সমগ্র দেহে পরিবাহিত হয় তাদের লসিকাবাহ বা লসিকানালি বলে। লসিকাবাহের প্রাচীরের তিনটি স্তর হলো– ফাইব্রিন কলা নিয়ে গঠিত বহিঃপ্রাচীর, পেশিময় মধ্যপ্রাচীর এবং এন্ডোথেলিয়াম বেষ্টিত অন্তঃপ্রাচীর।

লসিকাবাহের প্রাচীরের একস্তরী এন্ডোথেলিয়াম কোষগুলো এমনভাবে বিন্যস্ত থাকে যাতে কোনো বস্তু নালিকার ভেতর প্রবেশ করতে পারে কিন্তু বের হতে পারে না। দেহের বিভিন্ন স্থানের আন্তঃকোষীয় ফাঁকা স্থান থেকে সূক্ষ্ম ও বদ্ধপ্রান্ত বিশিষ্ট লসিকানালির যাত্রা শুরু হয়। অন্ত্রের প্রাচীরের সুবিকশিত লসিকানালিগুলোকে **ল্যাকটিয়েল** (lacteal) বলে। লসিকাবাহে কপাটিকা থাকে। সমস্ত দেহে অসংখ্য লসিকাবাহ থাকে। লসিকাবাহগুলো পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রধান দুটি বৃহৎ নালি গঠন করে, যথা– বাঁদিকে **থোরাসিক ডাক্ট বা বক্ষ লসিকানালি** এবং ডানদিকে **ডান লিম্ফাটিক ডাক্ট বা দক্ষিণ লসিকানালি**।

(ক) থোরাসিক ডাক্ট (Thoracic duct) : বাম দিকের লসিকাবাহগুলো মিলিত হয়ে যে প্রধান লসিকাবাহ গঠন করে তাকে থোরাসিক ডাক্ট বলে। থোরাসিক ডাক্ট **বাম সাবক্লেভিয়ান শিরায়** উন্মুক্ত থাকে।

(খ) ডান লিম্ফাটিক ডাক্ট (Right lymphatic) : ডান দিকের লসিকাবাহগুলো মিলিত হয়ে ডান লিম্ফাটিক ডাক্ট গঠন করে। এই ডাক্ট **ডান সাবক্লেভিয়ান শিরায়** উন্মুক্ত থাকে।

৪. লসিকা গ্রন্থি বা লসিকা পর্ব (Lymph gland/ Lymph node) : লসিকানালির স্বল্প ব্যবধানে বহু গোলাকার বা ডিম্বাকার বা বৃক্কাকার স্ফীত অংশ থাকে, এদের **লসিকা গ্রন্থি বা লসিকা পর্ব বা লসিকা-গণ্ড** বলে। এদের সংখ্যা অনেক (প্রায় ৪০০-৭০০)। সাধারণত লসিকাবাহের দৈর্ঘ্য বরাবর অবস্থান করে।

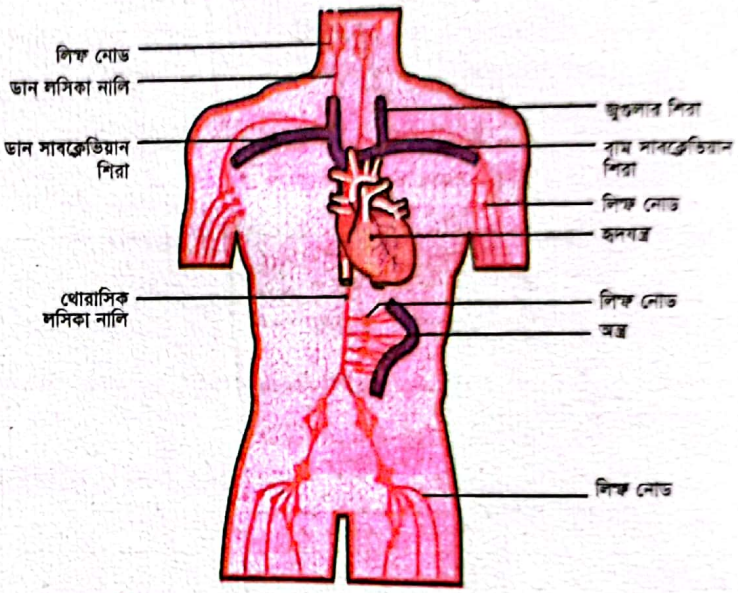

চিত্র ৪.৩ : মানুষের লসিকা সংবহনতন্ত্র

প্রতিটি লসিকাগ্রন্থি **ক্যাপসুল** (capsule) নামক আবরণ দিয়ে আবৃত। ভেতরের কলা বাইরের দিকে **কর্টেক্স** এবং ভেতরের দিকে **মেডুলা** নিয়ে গঠিত। লসিকাগ্রন্থি রক্তে **B-লিম্ফোসাইট** ও **T-লিম্ফোসাইট** সরবরাহ করে। লিম্ফোসাইট কোষ আগ্রাসন প্রক্রিয়ায় রোগজীবাণু ধ্বংস করে। প্লিহা (spleen), টনসিল (tonsil), অ্যাডেনয়েড (adenoid) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য লসিকাগ্রন্থি।

প্লিহাকে মানবদেহের সবচেয়ে বড় লসিকাগ্রন্থি হিসেবে গণ্য করা হয়। এটি রক্তের **রিজার্ভার** বা **ব্লাড ব্যাংক** নামেও পরিচিত এবং এটি প্রায় ৩০০ মিলিলিটার রক্ত জমা রাখে। টনসিল গলার ভেতরে ডান ও বাম দিকে অবস্থিত ছোট বলের মতো গঠন বিশেষ। এটি প্রচুর লিম্ফোসাইট ও অ্যান্টিবডি সৃষ্টি করে মুখে প্রবেশকৃত ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। অনেকসময় ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস দ্বারা টনসিল আক্রান্ত হয়ে **টনসিলাইটিস** (tonsillitis) বা টনসিলের প্রদাহ সৃষ্টি করে। লসিকাগ্রন্থিগুলো ঘাড়ে (neck), বগলে (armpit), কুঁচকিতে (groin) এবং থোরাসিক মিডিয়াস্টাইনামে (thoracic mediastinum) অধিক পরিমাণে থাকে। এরা যান্ত্রিক ছাঁকুনি হিসেবে কাজ করে এবং বিভিন্ন প্রকার জীবাণু ও ক্ষতিকর কোষের হাত থেকে দেহকে রক্ষা করে।

মানুষ ফাইলেরিয়া কৃমি (*Wuchereria bancrofti*) দ্বারা আক্রান্ত হলে লসিকানালি ও লসিকা গ্রন্থিগুলোতে লসিকা প্রবাহ বাধাগ্রস্থ হয় এবং এগুলো অস্বাভাবিক ফুলে গিয়ে **গোদ রোগ বা ফাইলেরিয়া বা এলিফ্যানটিয়াসিস** (elephantiasis) সৃষ্টি করে।

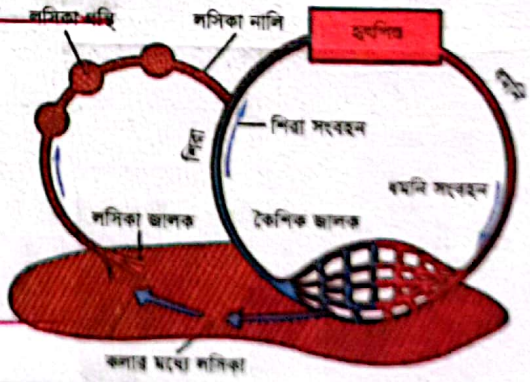

চিত্র ৪.৪(ক) : লসিকা সংবহনের রেখাচিত্র

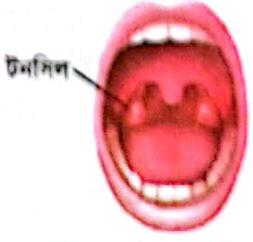

চিত্র ৪.৪(খ) : টনসিল

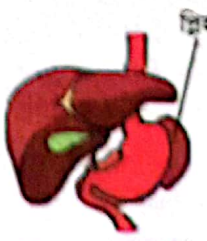

চিত্র ৪.৪(গ) : প্লিহা

লসিকা সংবহন (Circulation of lymph) : লসিকা রক্তজালক থেকে উৎপন্ন হয়ে কোষান্তর স্থানে আসে। সেখান থেকে লসিকা জালকে প্রবেশ করে। লসিকা জালক থেকে লসিকা লসিকাবাহে আসে এবং সেখান থেকে থোরাসিক ডাক্ট ও ডান লিম্ফাটিক ডাক্টে প্রবেশ করে। এই ডাক্ট থেকে লসিকা সাবক্লেভিয়ান শিরার মাধ্যমে রক্তে মুক্ত।

লসিকা সংবহনের রেখাচিত্র :

রক্তজালক → লসিকা কোষান্তর স্থান → লসিকা জালক → লসিকাবাহ → থোরাসিক ডাক্ট ও ডান লিম্ফাটিক ডাক্ট → সাবক্লেভিয়ান শিরা

প্লাজমা, লসিকা ও সিরামের মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	প্লাজমা বা রক্তরস	লসিকা	সিরাম
১। প্রকৃতি	রক্তের তরল অংশ।	রক্তজালক থেকে নিঃসৃত তরল অংশ।	রক্ত তঞ্চনের পর তঞ্চিত পদার্থ নিঃসৃত তরল অংশ।
২। রক্তকণিকা	লোহিত কণিকা, শ্বেতকণিকা এবং অনুচক্রিকা থাকে।	লিম্ফোসাইট প্রকৃতির শ্বেতকণিকা বিদ্যমান।	এতে রক্তকণিকা থাকে না।
৩। ফাইব্রিনোজেন	অধিক পরিমাণ থাকে।	সামান্য পরিমাণ থাকে।	অনুপস্থিত।
৪। অবস্থান	প্রধানত রক্তবাহে ও হৃৎপ্রকোষ্ঠে।	প্রধানত আন্তঃকোষীয় স্থানে।	সাধারণ অবস্থায় দেহে থাকে না।
৫। জমাট বাঁধার ক্ষমতা	জমাট বাধতে পারে।	জমাট বাঁধতে পারে না।	জমাট বাঁধতে পারে না।

লসিকা জালক ও রক্তজালকের মধ্যে পার্থক্য

লসিকা জালক	রক্তজালক
১। এটি বর্ণহীন হওয়ায় পর্যবেক্ষণ করা কঠিন।	১। লালচে রঙের হওয়ায় সহজেই পর্যবেক্ষণ করা যায়।
২। অগ্রভাগ বন্ধ।	২। একপ্রান্ত উপধমনির (arterioles) সঙ্গে এবং অপরপ্রান্ত উপশিরার (venules) সঙ্গে যুক্ত থাকে।
৩। রক্তজালক অপেক্ষা প্রশস্ত।	৩। লসিকা জালকের তুলনায় সরু।
৪। পুরুত্ব সব স্থানে সমান নয়।	৪। পুরুত্ব সব স্থানেই সমান।
৫। প্রাচীর পাতলা এন্ডোথেলিয়াম নিয়ে গঠিত এবং ভিত্তিপর্দা খুব দুর্বল।	৫। প্রাচীর সাধারণ এন্ডোথেলিয়াম ও ভিত্তিপর্দা দিয়ে গঠিত।
৬। বর্ণহীন লসিকা ধারণ করে।	৬। লাল রক্ত ধারণ করে।

কলারস (Tissue Fluid) [প্রাসঙ্গিক বিষয়]

দেহের আন্তঃকোষীয় ফাঁকে বিদ্যমান তরলকে **কলারস** বা **টিস্যু ফ্লুইড** বলে। ইহা কৈশিক নালিকা, কোষ ও লসিকার মধ্যে পুষ্টি পদার্থ, গ্যাস ও বিপাকীয় বর্জ্য পদার্থ বিনিময়ের সংযোগ সৃষ্টি করে। ইহা প্রকৃতপক্ষে দেহের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ গঠন করে এবং সকল কোষ-কলাকে পরিবেষ্টন করে রাখে। কলারস উৎপাদনে রক্ত এবং কোষ-কলা উভয়েই অংশগ্রহণ করে। তবে এর অধিকাংশই রক্তের প্লাজমা থেকে সৃষ্টি হয়।

কলারসের প্রকৃত উপাদান সঠিকভাবে জানা যায়নি। তবে যেহেতু ইহা রক্ত এবং কোষ-কলা থেকে সৃষ্টি হয় সেহেতু কোষ হতে আগত CO_2, রেচন বর্জ্য, পানি এবং কৈশিকনালিকার প্রাচীর ভেদ করে রক্ত থেকে আসা পানি, দ্রবীভূত O_2, খাদ্যসার, গ্লুকোজ, ফ্যাটি এসিড, অ্যামিনো এসিড, ভিটামিন, হরমোন, খনিজ পদার্থ ইত্যাদি কলারসের উপাদান হিসেবে গণ্য। কলারসে লোহিত রক্তকণিকা, প্লেটলেট (থ্রোম্বোসাইট) এবং প্লাজমা প্রোটিন থাকে না।

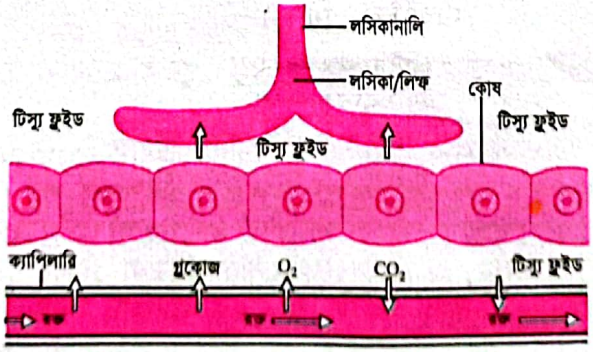

চিত্র ৪.৫ : রক্ত, লসিকা এবং টিস্যু ফ্লুইড

CamScanner

কলারসের কাজ

(১) কলারস দেহাভ্যন্তরে এমন একটি মাধ্যম গঠন করে যেখানে কোষ-কলা নিমজ্জিত থাকে। (২) কোষ কলারস থেকে অক্সিজেন ও পুষ্টি পদার্থ গ্রহণ করে এবং সকল বিপাকীয় বর্জ্য এতে ত্যাগ করে। (৩) ইহা পানি, লবণ ও পুষ্টি পদার্থের বৃহৎ ভাণ্ডার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। (৪) কলারসের পানি দেহে রক্তের পরিমাণের সাম্যতা রক্ষা করে। (৫) ইহা দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে অংশগ্রহণ করে। (৬) কৈশিক জালকের রক্ত কলারসের প্রায় ৯০% অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় পুনরায় গ্রহণ করে নেয়।

কলারস ও লসিকা-এর মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	কলারস	লসিকা
১। উৎপত্তি	রক্তের প্লাজমা থেকে উৎপন্ন হয়।	কলারস থেকে উৎপন্ন হয়।
২। অবস্থান	আন্তঃকোষীয় স্থানে।	লসিকাবাহে।
৩। প্রোটিন	অনুপস্থিত।	উপস্থিত।
৪। শ্বেত কণিকা	অনুপস্থিত।	উপস্থিত (লিম্ফোসাইট)।

ব্যবহারিক

পরীক্ষণের নাম : রক্তকণিকাসমূহের স্থায়ী স্লাইড পর্যবেক্ষণ।

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : ব্যবহারিক অংশ ৫৬৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]

৪.৩ মানুষের হৃৎপিণ্ডের গঠন (Structure of Human Heart)

হৃৎপিণ্ড (heart) রক্তসঞ্চালন প্রক্রিয়ার জন্য চাপ সৃষ্টিকারী মাংসল ফাঁপা, বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে বিভক্ত, সর্বক্ষণ নির্দিষ্ট ছন্দ ও হারে স্পন্দনশীল একটি প্রধান কেন্দ্রীয় যন্ত্র বিশেষ। যাকে সজীব পাম্পিং অঙ্গও বলা হয়। এটি ছান্দিক গতিতে সংকুচিত ও প্রসারিত হয়ে দেহের অঙ্গ ও কলায় O_2-যুক্ত রক্ত (ফুসফুস ব্যাতীত) সরবরাহ করে এবং সংশ্লিষ্ট অঙ্গ ও কলা থেকে CO_2-যুক্ত রক্ত গ্রহণ করে। একজন সুস্থ মানুষের জীবদ্দশায় হৃৎপিণ্ড গড়ে ২৬০০ মিলিয়ন বার স্পন্দিত হয়ে প্রতিটি নিলয় বা ভেন্ট্রিকল থেকে প্রায় ১৫৫ মিলিয়ন লিটার (বা দেড় লাখ টন) রক্ত বের করে দেয়।

১। অবস্থান (Position) : বক্ষগহ্বরের মেডিয়াস্টিনাল স্থানে (mediastinal space) অর্থাৎ মধ্যস্থলে একটু বেশি বাঁদিকে ঘেঁষে, উভয় ফুসফুসের মাঝখানে এবং মধ্যচ্ছদার উপরে হৃৎপিণ্ড অবস্থিত।

২। আকার ও আকৃতি (Shape and Size) : লালচে-খয়েরি বর্ণের হৃৎপিণ্ডটি প্রায় ত্রিকোণাকৃতির মোচার মতো এবং হৃৎপেশি দ্বারা গঠিত। এর চওড়া ঊর্ধ্বমুখী অংশটিকে **বেস** (base) ও ক্রমশ সরু নিম্নমুখী অংশটিকে **এপেক্স** (apex) বলে। একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের হৃৎপিণ্ডের দৈর্ঘ্য ১২ সেন্টিমিটার ও প্রস্থ ৯ সেন্টিমিটার এবং এটি ৬ সেন্টিমিটার পুরু। একটি হৃৎপিণ্ডের ওজন প্রায় ২৫০-৩৫০ গ্রাম (গড়ে ৩০০ গ্রাম)।

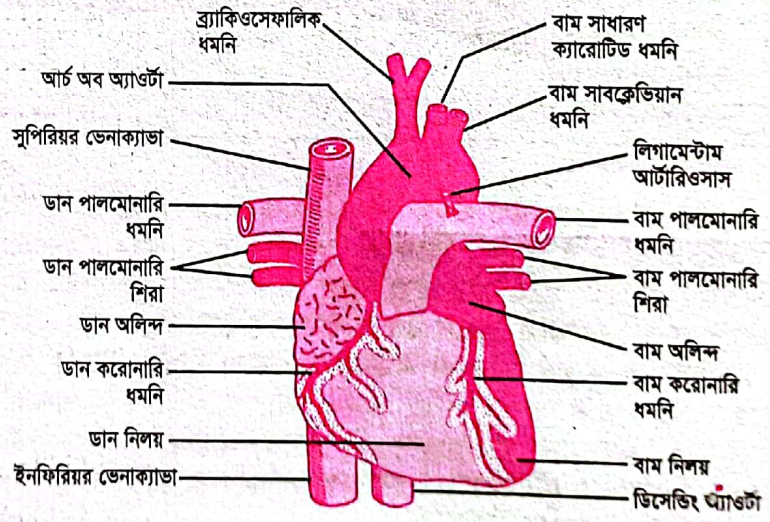

চিত্র ৪.৬ক : হৃৎপিণ্ডের বাহ্যিক গঠন

স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে এর ওজন পুরুষের চেয়ে এক-তৃতীয়াংশ কম হয়। পুরুষ ও মহিলাদের হৃৎপিণ্ডের ওজন, দেহ-ওজনের যথাক্রমে ০.৪৫% ও ০.৪০%।

৩। আবরণ (Covering) : সমগ্র হৃৎপিণ্ড দ্বিস্তরবিশিষ্ট **পেরিকার্ডিয়াম** (pericardium) নামক মসৃণ ও পাতলা আবরণ দ্বারা আবৃত থাকে। পেরিকার্ডিয়ামের হৃৎপিণ্ডসংলগ্ন স্তরকে **ভিসেরাল স্তর** (visceral layer) এবং বাইরের স্তরকে **প্যারাইটাল স্তর** (parietal layer) বলে। প্যারাইটাল স্তরটি হৃৎপিণ্ডকে অতিরিক্ত প্রসারিত হতে বাধা দেয়। দুটি স্তরের মাঝে একটি সংকীর্ণ গহ্বর থাকে। এ গহ্বরকে **পেরিকার্ডিয়াল গহ্বর** (pericardial cavity) বলে যা **পেরিকার্ডিয়াল তরল** (pericardial fluid) দ্বারা পূর্ণ থাকে। এই তরলের পিচ্ছিলতা হৃৎপিণ্ডের অবিরাম ছান্দিক স্পন্দনের অন্যতম কারণ। এ ছাড়া এই তরলই হৃৎপিণ্ডকে তাপ, চাপ ও ঘর্ষণজনিত আঘাত থেকে রক্ষা করে।

CamScanner

৪। হৃৎপিণ্ডের প্রাচীর (Walls of heart) : হৃৎপিণ্ড প্রাচীর অনৈচ্ছিক পেশি ও যোজক কলা দ্বারা গঠিত। এসব পেশিকে হৃৎপেশি বা কার্ডিয়াক পেশি (cardiac muscle) বলে। পেশিগুলো তিনটি স্তরে বিন্যস্ত থাকে। যথা :

(ক) এপিকার্ডিয়াম (Epicardium) : হৃৎপ্রাচীরের সবচেয়ে বাইরের স্তর, যা পাতলা ও স্বচ্ছ যোজক কলা নির্মিত। এ স্তরে বিক্ষিপ্তভাবে চর্বি লেগে থাকে।

(খ) মায়োকার্ডিয়াম (Myocardium) : হৃৎপ্রাচীরের মধ্যবর্তী স্তর। এই স্তরটি সর্বাপেক্ষা পুরু এবং হৃৎপেশি দ্বারা গঠিত। এটি হৃৎপিণ্ডের প্রাচীরের সংকোচন-প্রসারণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। অলিন্দের মায়োকার্ডিয়ামের স্থূলতা নিলয়ের চেয়ে কম।

(গ) এন্ডোকার্ডিয়াম (Endocardium) : এটি যোজক কলা নির্মিত হৃৎপ্রাচীরের সবচেয়ে ভেতরের স্তর, যা মসৃণ এবং অপেক্ষাকৃত পাতলা। এটি হৃৎপিণ্ডের প্রকোষ্ঠের অন্তঃপ্রাচীর গঠন করে, হৃৎকপাটিকাসমূহ ঢেকে রাখে এবং রক্তবাহিকার সঙ্গে হৃৎপিণ্ডের অবিচ্ছিন্ন সংযোগ ঘটায়।

৫। হৃৎপিণ্ডের প্রকোষ্ঠ (Chambers of heart) : মানুষের হৃৎপিণ্ডে প্রকোষ্ঠের সংখ্যা **চারটি**। উপরের দুটিকে ডান ও বাম **অলিন্দ** বা **অ্যাট্রিয়াম** (right & left atrium; pl. atria) এবং নিচের দুটিকে ডান ও বাম **নিলয়** বা **ভেন্ট্রিকল** (right & left ventricle) বলে। অলিন্দ হৃৎপিণ্ডের **গ্রাহক প্রকোষ্ঠ** এবং নিলয় হৃৎপিণ্ডের **প্রেরক প্রকোষ্ঠ** হিসেবে কাজ করে। হৃৎপিণ্ডের এ বিভাজন বাইরের দিক থেকে **করোনারি সালকাস** (coronary sulcus) নামক খাঁজের মাধ্যমে দৃশ্যমান হয়।

(ক) অলিন্দ (Atrium) : দুটি অলিন্দই পাতলা প্রাচীর বিশিষ্ট প্রকোষ্ঠ। কারণ অলিন্দের সংকোচনে রক্ত কেবল নিলয় পর্যন্ত পৌঁছায়। অলিন্দদ্বয়ের মাঝে **আন্তঃঅলিন্দ পর্দা** (inter-atrial septum) থাকে। এর ফলে O_2 ও CO_2 যুক্ত (অর্থাৎ বিশুদ্ধ ও দূষিত) রক্তের মিশ্রণ ঘটে না। ডান অলিন্দটি বাম অলিন্দের চেয়ে সামান্য বড়। একটি ঘনক্ষেত্রকার ডান অলিন্দে তিনটি বৃহৎ শিরা উন্মুক্ত হয়। যথা :

(১) উপরের দিকে **উর্ধ্ব মহাশিরা** বা **সুপিরিয়র ভেনাক্যাভা** (superior vena cava), (২) নিচের দিকে **নিম্ন মহাশিরা** বা **ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভা** (inferior vena cava) এবং (৩) মাঝের দিকে **করোনারিসাইনাস** (coronary sinus)। ডান অলিন্দ একটি **ডান অলিন্দ-নিলয় ছিদ্র** (right atrio-ventricular orifice) দ্বারা ডান নিলয়ে উন্মুক্ত হয়।

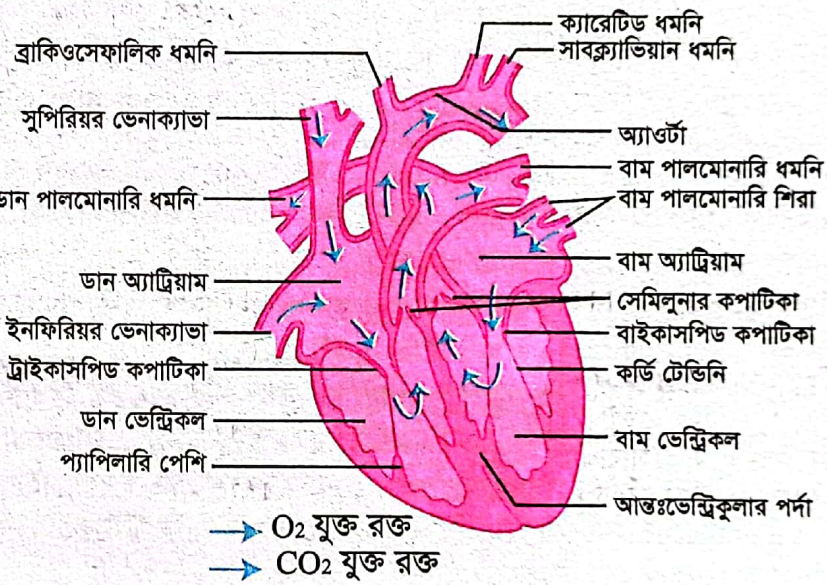

চিত্র ৪.৬খ : হৃৎপিণ্ডের লম্বচ্ছেদ [তীর চিহ্ন (→) দিয়ে রক্তের গতিপথ দেখানো হয়েছে]

বাম অলিন্দ একটি ছোট ত্রিকোণাকার প্রকোষ্ঠ বিশেষ। প্রতি পাশে দুটি করে মোট চারটি ফুসফুসীয় বা পালমোনারি শিরা (pulmonary vein) উপরের দিকে কপাটিকাবিহীন ছিদ্রের মাধ্যমে বাম অলিন্দে উন্মুক্ত হয়। বাম অলিন্দ একটি **বাম অলিন্দ-নিলয় ছিদ্র** (left atrio-ventricular orifice) দ্বারা বাম নিলয়ে উন্মুক্ত হয়।

(খ) নিলয় (Ventricle) : দুটি নিলয়ই পুরু প্রাচীর বিশিষ্ট। বাম নিলয়ের প্রাচীর সবচেয়ে বেশি পেশিবহুল ও পুরু। এটি ডান নিলয়ের প্রাচীর থেকে প্রায় তিন গুণ পুরু থাকে। এর কারণ হচ্ছে, ডান নিলয় কেবল ফুসফুসে রক্ত সঞ্চালিত করে কিন্তু বাম নিলয়ের সংকোচনে সারাদেহে রক্ত সঞ্চালিত হয়। দুটি নিলয়ের প্রাচীরেই খাঁজ থাকে। এ খাঁজগুলোকে **কলামনি কার্নি** বা **ট্রাবিকিউলি কার্নি** (columnae carneae or trabeculae carnae) বলে। এ খাঁজে **প্যাপিলারি পেশি** (papillary muscle) নামক বিশেষ হৃৎপেশি যুক্ত থাকে। নিলয় দুটি একটি **আন্তঃনিলয় পর্দা** (inter-ventricular septum) দ্বারা পরস্পর থেকে পৃথক থাকে। এর ফলে O_2 ও CO_2 যুক্ত রক্তের মিশ্রণ ঘটে না। ডান নিলয় থেকে **পালমোনারি ধমনি** (pulmonary artery) এবং বাম নিলয় থেকে সিস্টেমিক **মহাধমনি বা অ্যাওর্টা** (aorta) বের হয়।

CamScanner

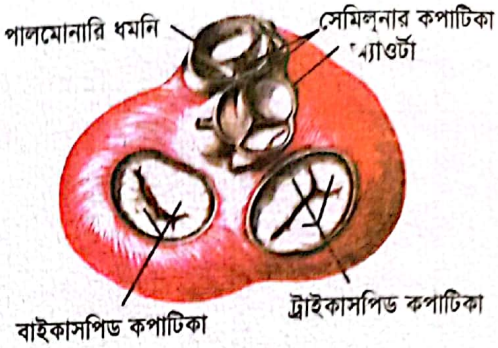

চিত্র ৪.৬গ : মানুষের হৃৎপিণ্ডের কপাটিকাসমূহ

৬। হৃৎপিণ্ডের কপাটিকা (Valves of heart) : যা ধমনি বা শিরার রক্তকে একত্রে মিশতে না দিয়ে রক্তপ্রবাহের গতিকে নিয়ন্ত্রিত করে একমুখী করে, তাকেই **কপাটিকা** (valve) বলে। ডান অলিন্দ ও ডান নিলয়ের মাঝে **ট্রাইকাসপিড কপাটিকা** (tricuspid valve, তিনটি ঝিল্লিময় কাস্প বা ফ্লাপ বিশিষ্ট এবং আয়তন ৭-৯ বর্গসেন্টিমিটার) এবং বাম অলিন্দ ও বাম নিলয়ের মাঝে **বাইকাসপিড কপাটিকা** (bicuspid valve, দুটি ঝিল্লিময় কাস্প বা ফ্লাপ বিশিষ্ট এবং আয়তন ৪-৬ বর্গসেন্টিমিটার) বা **মাইট্রাল কপাটিকা** (mitral valve) অবস্থান করে। উভয় ধরনের কপাটিকা নিলয় প্রাচীরের মাংসল অভিক্ষেপকারী **প্যাপিলারি পেশির** (papillary muscle) সাথে **কর্ডি টেন্ডিনি** (chordae tendinae) নামক সূক্ষ্ম, দৃঢ় তন্তু দিয়ে যুক্ত থাকে। ডান নিলয় থেকে উদ্ভূত পালমোনারি ধমনি ছিদ্রপথে এবং বাম নিলয় থেকে সৃষ্ট **আওর্টার** মুখে **সেমিলুনার** (semilunar) বা **অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকা** বা **পকেট ভাল্ব** বিদ্যমান। বাইকাসপিড ও ট্রাইকাসপিড কপাটিকা সামনের দিকে যুক্ত থাকায় কপাটিকাগুলো রক্তের চাপে বিপরীত দিকে ফিরে যায় না। অর্থাৎ রক্ত অলিন্দ থেকে নিলয়ে এলেও নিলয়ের সংকোচনের সময় অলিন্দে ফিরে যেতে পারে না। সেমিলুনার কপাটিকা ধমনিতে প্রবাহিত রক্ত নিলয়ে ফিরে আসতে দেয় না। **পালমোনারি সেমিলুনার কপাটিকা** ডান নিলয় ও পালমোনারি ধমনির সংযোগস্থলে এবং **অ্যাওর্টিক সেমিলুনার কপাটিকা** বাম নিলয় ও অ্যাওর্টার সংযোগস্থলে অবস্থিত। এছাড়া **থিবেসিয়ান** বা **করোনারি কপাটিকা** করোনারি সাইনাস ও ডান অলিন্দ এবং **ইউস্টেশিয়ান কপাটিকা** (eustachian valve) ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভা ও ডান অলিন্দের সংযোগস্থলে অবস্থিত।

৭। হৃৎপেশি (Muscles of heart) : হৃৎপিণ্ডের প্রাচীর বিশেষ ধরনের অনৈচ্ছিক পেশি দ্বারা গঠিত। এদের **কার্ডিয়াক পেশি** বা হৃৎপেশি বলে। এদের কিছু বৈশিষ্ট্য কঙ্কালপেশি বা অন্যান্য পেশির মতো হলেও এরা নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য দ্বারা অন্যান্য পেশি হতে আলাদা–

- এদের স্বতঃস্ফূর্ত ছন্দময় সংকোচন-প্রসারণশীলতা সম্পূর্ণরূপে অনৈচ্ছিক, কখনো ক্লান্ত হয় না।
- এদের কোষের কেন্দ্রের দিকে একটি নিউক্লিয়াস থাকে।
- এদের তন্তুগুলো সরল চোঙ্গাকৃতির নয়, বরং এগুলো দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পাশেরটির সাথে মিশে ত্রৈমাত্রিক নেটওয়ার্ক গঠন করে, যা অপ্রকৃত **সিনসাইসিয়ামের** (syncycium) মতো দেখায়।
- এদের কোষের সারকোপ্লাজমে সমান্তরালে সজ্জিত **মায়োফাইব্রিল** (myofibrils) নামক সূক্ষ্ম তন্তু থাকে।
- কোষের সারকোলেমা মিলিত হয়ে চাকতির ন্যায় **ইন্টারক্যালেটেড ডিস্ক** (intercalated disc) নামক একটি বিশেষ অনুপ্রস্থ রেখা সৃষ্টি করে।
- হৃৎপেশি হৃৎপিণ্ডের প্রতিরক্ষাকারী স্তর গঠন করে।
- হৃৎপেশির কোষগুলোতে (cardiomyocytes) মাইটোকন্ড্রিয়ার আধিক্য দেখা যায়, যা কোষের অবিরাম অবাত শ্বসনের সুযোগ প্রদান করে।
- অধিকাংশ হৃৎপেশি হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত রক্তনালিতে প্রেরণের কাজে নিয়োজিত থাকে।

৮। হৃৎপিণ্ডের সংযোগী টিস্যু (Junctional tissues of heart) : হৃৎপেশিতে কতগুলো প্রয়োজনীয় ও বিশেষ ধরনের গঠন থাকে, যারা হৃৎস্পন্দন সৃষ্টি ও পরিবহন করে। এদেরকে হৃৎপিণ্ডের **সংযোগী টিস্যু** বা **সংযোগকারী টিস্যু** বলে। এগুলো হলো–

(ক) সাইনো-অ্যাট্রিয়াল নোড (Sino-atrial Node = SAN)
(খ) অ্যাট্রিও-ভেন্ট্রিকুলার নোড (Atrio-ventricular Node = AVN)
(গ) বান্ডল অব হিজ (Bundle of His = BH)
(ঘ) বান্ডল অব হিজের ডান ও বাম শাখা (Right & Left branches of BH)
(ঙ) পারকিন্‌জি ফাইবার (Purkinje fibres)

❐ **কাজ :** শিক্ষক শিক্ষার্থীদের হৃৎপিণ্ডের লম্বচ্ছেদের চিহ্নিত চিত্র পোস্টার পেপারে অঙ্কন করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করতে বলবেন।

CamScanner

মানুষের হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন কপাটিকার নাম, অবস্থান, বৈশিষ্ট্য ও কাজ

নাম	অবস্থান	বৈশিষ্ট্য	কাজ
১। বাইকাসপিড কপাটিকা বা মাইট্রাল কপাটিকা বা দ্বিপত্র কপাটিকা	বাম অ্যাট্রিয়াম ও বাম ভেন্ট্রিকলের সংযোগস্থলে।	দুই কাস্প (cusp)/ফ্লাপ (flap)/ পাল্লাযুক্ত কপাটিকা	বাম অ্যাট্রিয়াম থেকে বাম ভেন্ট্রিকলে রক্তপ্রবাহে সাহায্য করে এবং এর বিপরীত প্রবাহে বাধা দেয়।
২। ট্রাইকাসপিড কপাটিকা বা ত্রিপত্র কপাটিকা	ডান অ্যাট্রিয়াম ও ডান ভেন্ট্রিকলের সংযোগস্থলে।	তিন পাল্লাযুক্ত কপাটিকা	ডান অ্যাট্রিয়াম থেকে ডান ভেন্ট্রিকলে রক্তপ্রবাহে সাহায্য করে এবং এর বিপরীত প্রবাহে বাধা দেয়।
৩। অ্যাওর্টিক কপাটিকা	বাম ভেন্ট্রিকল ও অ্যাওর্টার সংযোগস্থলে।	অর্ধচন্দ্রাকার/ সেমিলুনার কপাটিকা	বাম ভেন্ট্রিকল থেকে অ্যাওর্টায় রক্তপ্রবাহে সাহায্য করে এবং এর বিপরীত প্রবাহে বাধা দেয়।
৪। পালমোনারি কপাটিকা	ডান ভেন্ট্রিকল ও পালমোনারি ধমনির সংযোগস্থলে।	সেমিলুনার কপাটিকা	ডান ভেন্ট্রিকল থেকে পালমোনারি ধমনীতে রক্তপ্রবাহে সাহায্য করে এবং এর বিপরীত প্রবাহে বাধা দেয়।
৫। থিবেসিয়ান বা করোনারি কপাটিকা	কারোনারি সাইনাস ও ডান অ্যাট্রিয়ামের সংযোগস্থলে।	সেমিলুনার কপাটিকা	করোনারি সাইনাস থেকে ডান অ্যাট্রিয়ামে রক্তপ্রবাহে সাহায্য করে এবং এর বিপরীত প্রবাহে বাধা দেয়।
৬। ইউস্টেসিয়ান কপাটিকা	ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভা ও ডান অ্যাট্রিয়ামের সংযোগস্থলে।	সেমিলুনার কপাটিকা	ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভা থেকে ডান অ্যাট্রিয়ামে রক্তপ্রবাহে সাহায্য করে এবং এর বিপরীত প্রবাহে বাধা দেয়।

অ্যাট্রিও ভেন্ট্রিকুলার কপাটিকা ও সেমিলুনার কপাটিকার মধ্যে পার্থক্য

অ্যাট্রিও ভেন্ট্রিকুলার কপাটিকা	সেমিলুনার কপাটিকা
১। অ্যাট্রিয়াম ও ভেন্ট্রিকলের ছিদ্র পথে অবস্থিত।	১। অ্যাওর্টা ও পালমোনারি ধমনির উৎপত্তি স্থলে অবস্থিত।
২। অ্যাট্রিয়াম থেকে ভেন্ট্রিকলে একমুখী রক্তপ্রবাহে সাহায্য করে।	২। ভেন্ট্রিকল থেকে ধমনিতে একমুখী রক্তপ্রবাহে সাহায্য করে।
৩। দুই বা তিন ফ্লাপযুক্ত ।	৩। অর্ধচন্দ্রাকৃতি। এদেরকে পকেট ভাল্ব বলে ।
৪। কপাটিকাগুলো কর্ডি টেন্ডিনির সাথে যুক্ত।	৪। কর্ডি টেন্ডিনির সাথে যুক্ত নয়। কপাটিকাগুলো রক্তনালির প্রাচীরের সাথে সংযুক্ত।

হৃৎপিণ্ডের মাধ্যমে রক্তসংবহন (Circulation of Blood by Heart)

মানব হৃৎপিণ্ড মিনিটে ৭০-৮০ বার (গড়ে ৭৫ বার) স্পন্দিত হয়। অর্থাৎ দিনে প্রায় ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) বার স্পন্দন ঘটে। তাছাড়া এতে যে চাপের সৃষ্টি হয় তাতে ধমনি, শিরা ও কৈশিক জালকের মাধ্যমে ৮০,০০০ কিলোমিটারেরও অধিক পথ অতিক্রম সম্ভব হয়। দেহের সমস্ত রক্ত প্রতি ৬০ সেকেন্ডে একবার সমগ্র মানবদেহ পরিভ্রমন করে। হৃৎপিণ্ডের সংকোচন-প্রসারণের ফলেই হৃৎস্পন্দন হয়। হৃৎপিণ্ডের সংকোচনকে বলে **সিস্টোল** (systole) এবং প্রসারণকে বলে **ডায়াস্টোল** (diastole)। হৃৎপিণ্ডের সব প্রকোষ্ঠ একসঙ্গে সংকুচিত বা প্রসারিত হয় না। হৃৎপিণ্ডে অ্যাট্রিয়ামদ্বয় (অলিন্দদ্বয়) সংকুচিত হলে ভেন্ট্রিকলদ্বয় (নিলয়দ্বয়) প্রসারিত হয় আবার ভেন্ট্রিকলদ্বয় সংকুচিত হলে অ্যাট্রিয়ামদ্বয় প্রসারিত হয়। এভাবে হৃৎপিণ্ডের পর্যায়ক্রমিক সংকোচন-প্রসারনের ফলে রক্ত সমগ্র দেহে সংবহিত হয়। মানুষের হৃৎপিণ্ডে **দ্বি-বর্তনী বা দ্বৈত সংবহন** (double circuit circulation) ঘটে। **যে রক্ত সংবহনতন্ত্রে রক্ত সমগ্র দেহে একবার পরিপূর্ণ চক্র সম্পন্ন করার পূর্বে হৃৎপিণ্ড দিয়ে দু'বার প্রবাহিত হয় তাকে দ্বি-বর্তনী বা দ্বৈত সংবহনতন্ত্র বলে।** এ ধরনের সংবহন মানুষসহ সকল স্তন্যপায়ী এবং সকল পাখিদের থাকে। হৃৎপিণ্ডে রক্তসংবহন নিম্নরূপে সম্পন্ন হয়–

১। হৃৎপিণ্ডের অ্যাট্রিয়াম দুটি যখন **প্রসারিত** (ডায়াস্টোল) অবস্থায় থাকে তখন দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে রক্ত হৃৎপিণ্ডের অ্যাট্রিয়ামে প্রবেশ করে। সারাদেহ থেকে CO_2 যুক্ত রক্ত **সুপিরিয়র ও ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভা** (ঊর্ধ্ব ও নিম্ন মহাশিরা) দিয়ে ডান অ্যাট্রিয়ামে আসে এবং ফুসফুস থেকে O_2 যুক্ত রক্ত **পালমোনারি শিরা** দিয়ে বাম অ্যাট্রিয়ামে আসে। হৃৎপেশি থেকে CO_2 যুক্ত রক্ত **করোনারি সাইনাস** দিয়ে ডান অ্যাট্রিয়ামে আসে। এ সময় **বাইকাসপিড ও ট্রাইকাসপিড কপাটিকা** বন্ধ থাকে।

CamScanner

২। অ্যাট্রিয়ামদ্বয় রক্তপূর্ণ হলে **সংকুচিত** (সিস্টোল) হয়। এ সময় অ্যাট্রিয়ামের রক্তচাপ বৃদ্ধি পায় এবং **বাইকাসপিড ও ট্রাইকাসপিড কপাটিকা** খুলে যায়, ফলে ডান অ্যাট্রিয়াম থেকে CO_2 যুক্ত রক্ত ডান ভেন্ট্রিকলে এবং বাম অ্যাট্রিয়াম থেকে O_2 যুক্ত রক্ত বাম ভেন্ট্রিকলে আসে। এই সময় ভেন্ট্রিকলদ্বয় প্রসারিত অবস্থায় থাকে।

৩। ভেন্ট্রিকলদ্বয় রক্তপূর্ণ হলে **সংকুচিত** হয়। ফলে ভেন্ট্রিকলের রক্তচাপ বৃদ্ধি পায় এবং বাইকাসপিড ও ট্রাইকাসপিড কপাটিকা বন্ধ হয়ে যায় এবং **পালমোনারি ও অ্যাওর্টিক কপাটিকা** খুলে যায়। তখন ডান ভেন্ট্রিকল থেকে CO_2 যুক্ত রক্ত পালমোনারি ধমনিতে এবং বাম ভেন্ট্রিকল থেকে O_2 যুক্ত রক্ত অ্যাওর্টায় (মহাধমনি) প্রবেশ করে।

এভাবে হৃৎপিণ্ডের পর্যায়ক্রমিক সিস্টোল ও ডায়াস্টোলের মাধ্যমে মানব হৃৎপিণ্ডে তথা সারাদেহে রক্ত সংবহিত হয়। ফুসফুস থেকে হৃৎপিণ্ডে এবং হৃৎপিণ্ড থেকে ফুসফুসে রক্ত সঞ্চালনকে **পালমোনারি সংবহন** বলে। অপরদিকে হৃৎপিণ্ড ও দেহের মধ্যে রক্ত সঞ্চালনকে **সিস্টেমিক সংবহন** বলে। হৃৎপিণ্ডের প্রাচীরে কোনো নিউরন নেই। সাইনো-অ্যাট্রিয়াল নোড (SAN) বা পেসমেকার এবং অন্যান্য নোডাল টিস্যু দ্বারা হৃৎস্পন্দন শুরু ও নিয়ন্ত্রিত হয়।

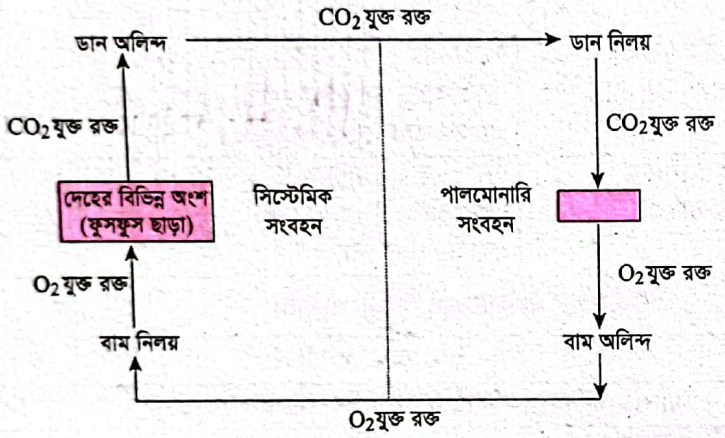

চিত্র ৪.৭ক : মানব হৃৎপিণ্ডের দ্বি-বর্তনী সংবহন(সরল চিত্র)

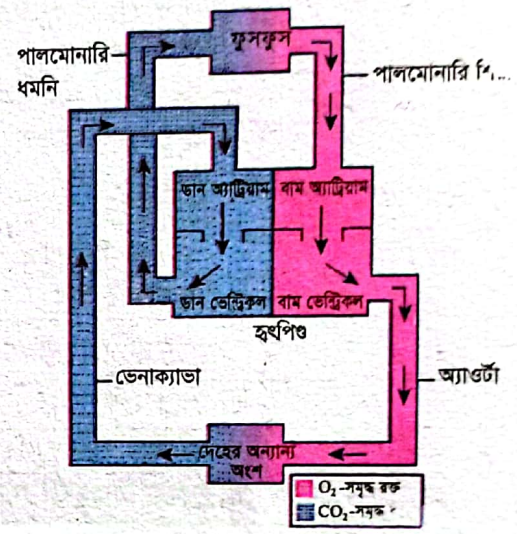

চিত্র ৪.৭খ : হৃৎপিণ্ডের মাধ্যমে রক্তসংবহন (সরল চিত্র)

❐ **হৃৎপিণ্ডের মাধ্যমে রক্ত সংবহনের প্রবাহচিত্র :**

সুপিরিয়র ও ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভা → ডান অ্যাট্রিয়াম → ডান অ্যাট্রিও– ভেন্ট্রিকুলার ছিদ্রপথ → ডান ভেন্ট্রিকল → পালমোনারি ধমনি → ফুসফুস
↑ CO_2 যুক্ত রক্ত — O_2 যুক্ত রক্ত ↓
সমগ্রদেহ ← অ্যাওর্টা ← বাম ভেন্ট্রিকল ← বাম অ্যাট্রিও–ভেন্ট্রিকুলার ছিদ্রপথ ← বাম অ্যাট্রিয়াম ← পালমোনারি শিরা

❐ **কাজ :** (i) হৃৎপিণ্ডের লম্বচ্ছেদের চিহ্নিত চিত্র আঁক। (ii) হৃৎপিণ্ডের কপাটিকাসমূহের বিবরণ দাও। (iii) হৃৎপিণ্ডে যে সমস্ত কপাটিকা আছে তাদের গুরুত্ব উল্লেখ কর। (iv) স্তন্যপায়ী প্রাণীদের রক্তসংবহন প্রক্রিয়া ছকের সাহায্য দেখাও। (v) হৃৎপিণ্ডে রক্তসঞ্চালন গতিপথ কপাটিকা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়– ব্যাখ্যা কর।

৪.৪ কার্ডিয়াক চক্র বা হার্টবিটের দশাসমূহ (Cardiac cycle or Stages of heartbeat)

হৃৎপিণ্ডের একবার সংকোচন (সিস্টোল) ও একবার প্রসারণ (ডায়াস্টোল)-কে একত্রে **হার্টবিট** বা **হৃৎস্পন্দন** (heart beat) বলে। একজন প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ মানুষের হৃৎস্পন্দনের হার প্রতি মিনিটে প্রায় ৭০-৮০ বার। সদ্যজাত ভ্রূণের হৃদগতি মিনিটে ১৪০-১৫০ বার। ব্যায়াম ও দৈহিক পরিশ্রমের সময় হৃদগতি বৃদ্ধি পায়। দেহের আকার ছোট হলে হৃদগতি বেশি হয়। বিশ্রাম, নিদ্রা ইত্যাদির সময় হৃদগতি মন্থর হয়। **একটি হৃৎস্পন্দন বা হার্টবিট সম্পন্ন করতে হৃৎপিণ্ডে পরপর সংঘটিত ঘটনার সমষ্টিকে কার্ডিয়াক চক্র বা হৃৎচক্র বলে।** এ চক্রে হৃৎপিণ্ডে অ্যাট্রিয়াম ও ভেন্ট্রিকলের বারবার সংকোচন এবং প্রসারণের সাথে সংশ্লিষ্ট। যদি প্রতি মিনিটে গড়ে ৭৫ বার হৃৎস্পন্দন হয় তবে কার্ডিয়াক চক্রের সময়কাল $\frac{৬০}{৭৫} = ০.৮$ সেকেন্ড। স্বাভাবিকভাবেই একটি কার্ডিয়াক চক্রের স্থিতিকাল ০.৮ সেকেন্ড।

CamScanner

কার্ডিয়াক চক্র বা হার্টবিটের ধাপসমূহ

১। অ্যাট্রিয়ামের ডায়াস্টোল (Atrial diastole) : এ সময় অ্যাট্রিয়াম প্রসারিত বা শিথিল অবস্থায় থাকে। বাইকাসপিড ও ট্রাইকাসাপিড কপাটিকা বন্ধ থাকে। অ্যাট্রিয়াম মধ্যবর্তী চাপ হ্রাস পায়, ফলে দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে CO_2 সমৃদ্ধ রক্ত সুপিরিয়র ও ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভা (superior & inferior vena cava) দিয়ে ডান অ্যাট্রিয়ামে এবং ফুসফুস থেকে O_2 সমৃদ্ধ রক্ত বাম অ্যাট্রিয়ামে প্রবেশ করে। হৃৎপিণ্ডের পেশি থেকে CO_2 সমৃদ্ধ রক্ত ডান অ্যাট্রিয়ামে প্রবেশ করে। দশার সময়কাল ০.৭ সেকেন্ড।

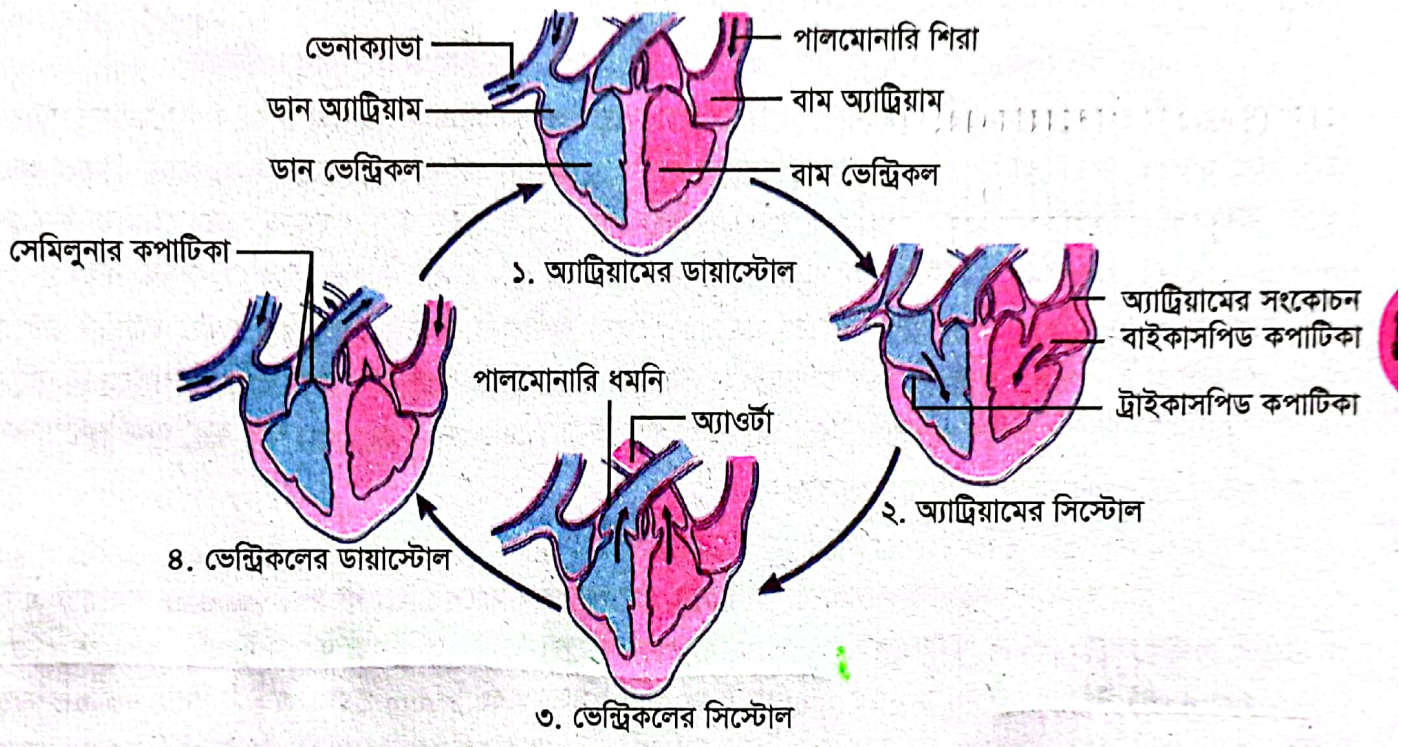

চিত্র ৪.৮ : কার্ডিয়াক চক্রের বিভিন্ন ধাপে হৃৎপিণ্ডের অবস্থা

২। অ্যাট্রিয়ামের সিস্টোল (Atrial systole) : উভয় অ্যাট্রিয়াম একই সঙ্গে সংকুচিত হয়। যদিও সংকোচনের ঢেউ প্রথমে ডান অ্যাট্রিয়াম থেকে শুরু করে বাম অ্যাট্রিয়ামে ছড়িয়ে পড়ে। ডান অ্যাট্রিয়ামের **সাইনো অ্যাট্রিয়াল নোড** বা SAN থেকে সংকোচনের সূত্রপাত ঘটে। এর ফলে ট্রাইকাসপিড ও বাইকাসপিড কপাটিকা খুলে যায়। ডান অলিন্দ থেকে CO_2 সমৃদ্ধ রক্ত ও বাম অলিন্দ থেকে O_2 সমৃদ্ধ রক্ত ডান ও বাম ভেন্ট্রিকলে প্রেরিত হয়। অ্যাট্রিয়ামের সিস্টোল ০·১ সেকেন্ড স্থায়ী হয়। অ্যাট্রিয়ামের সিস্টোল দুটি পর্যায়ে সম্পন্ন হয় : (i) **গতিশীল পর্যায়** (dynamic phase): অ্যাট্রিয়াম সিস্টোলের প্রথমার্ধে সংকোচন বল (force of contraction) বেশি থাকায় এ পর্যায়ের সৃষ্টি হয়। এর স্থিতিকাল প্রায় ০.০৫ সেকেন্ড। (ii) **গতিহীন পর্যায়** (adynamic phase): অ্যাট্রিয়াম সিস্টোলের শেষের দিকে সংকোচন বল অপেক্ষাকৃত কম থাকায় এ পর্যায়ের সৃষ্টি হয়। এ পর্যায় খুব কম পরিমাণ রক্ত নিলয়ে প্রেরিত হয়। এর স্থিতিকালও প্রায় ০.০৫ সেকেন্ড।

৩। ভেন্ট্রিকলের সিস্টোল (Ventricular systole) : অ্যাট্রিয়ামের সিস্টোলের পরপরই (প্রায় ০.১-০.২ সেকেন্ড পর) রক্তপূর্ণ অবস্থায় ভেন্ট্রিকলের সংকোচন ঘটে। ভেন্ট্রিকলের সংকোচনে ভেন্ট্রিকলে চাপ বৃদ্ধি পায়। ফলে বাইকাসপিড ও ট্রাইকাসপিড কপাটিকা বন্ধ হয় এবং একই সঙ্গে পালমোনারি ধমনি ও অ্যাওর্টার মুখের সেমিলুনার কপাটিকা খুলে গিয়ে অ্যাট্রিয়ামের রক্ত ধমনিতে প্রবেশ করে। নিলয়ের সিস্টোলের কারণে বাইকাসপিড ও ট্রাইকাসপিড কপাটিকা বন্ধের সময় প্রথম যে শব্দের সৃষ্টি হয় তাকে **লাব** (lub) বলে। এই দশায় সময়কাল ০.৩ সেকেন্ড।

CamScanner

৪। **ভেন্ট্রিকলের ডায়াস্টোল (Ventricular diastole) :** ভেন্ট্রিকলের সিস্টোলের পরপর ডায়াস্টোল শুরু হয়ে যখনই ভেন্ট্রিকল প্রসারিত হতে থাকে তখন ভেন্ট্রিকল মধ্যস্থ চাপ কমতে থাকে। ফলে অ্যাওর্টা ও পালমোনারি ধমনিতে যে উচ্চচাপের সৃষ্টি হয় তাতে কিছু রক্ত ভেন্ট্রিকলে ফিরে আসতে চায়; কিন্তু অতি দ্রুত ধমনির মুখের সেমিলুনার কপাটিকা বন্ধ হয়ে যায়। এই সময় ডাব (dub) সদৃশ দ্বিতীয় শব্দ উৎপন্ন হয়। সুতরাং হৃৎপিন্ডের শব্দগুলো হল-

ভেন্ট্রিকলের সিস্টোল = লাব (lub) এবং ভেন্ট্রিকলের ডায়াস্টোল = ডাব (dub)

ভেন্ট্রিকলের প্রসারণ অব্যাহত থাকায় এর অভ্যন্তরের চাপ ক্রমশ কমতে থাকে এবং তা যখন অ্যাট্রিয়ামের চাপের নিচে নেমে যায় তখন **অ্যাট্রিও-ভেন্ট্রিকুলার** ছিদ্র খুলে যায়। ভেন্ট্রিকল তখন অ্যাট্রিয়াম থেকে আসা রক্ত দ্বারা পূর্ণ হতে থাকে। সামান্য বিশ্রামের পর আবার ভেন্ট্রিকলের সিস্টোল শুরু হয়। এই দশার সময়কাল ০.৫ সেকেন্ড।

হার্টবিট নিয়ন্ত্রণে SA নোড, AV নোড এবং পারকিনজি আঁশের ভূমিকা

মানুষসহ বিভিন্ন স্তন্যপায়ী প্রাণীর হৃৎপিণ্ড স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংকুচিত-প্রসারিত হয়ে সমগ্র দেহে রক্ত সঞ্চালন ঘটায়। এতে প্রচণ্ড গতিতে রক্ত প্রবাহিত হয়। **বাইরের কোনো উদ্দীপনা ছাড়াই (অর্থাৎ স্নায়ুতন্ত্র বা হরমোন, কিংবা অন্য কোনো উদ্দীপনা) হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। এই ধরনের নিয়ন্ত্রণকে মায়োজেনিক নিয়ন্ত্রণ** (myogenic regulation) **বলে।** কোনো স্তন্যপায়ী প্রাণীর হৃৎপিণ্ড তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে O_2-সমৃদ্ধ লবণ দ্রবণে ৩৭° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় রেখে দিলে তাতে বাইরের কোনো উদ্দীপনা ছাড়াই বেশ কিছু পর্যন্ত হার্টবিট চলতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে হৃৎপিণ্ডের প্রাচীরের কিছু রূপান্তরিত হৃৎপেশি মায়োজেনিক প্রকৃতির জন্য দায়ী। হৃৎপিণ্ডে বিদ্যমান এই বিশেষ ধরনের পেশিগুলোকে **সংযোগী টিস্যু বা জাংশনাল টিস্যু** (junctional tissues) বলা হয়, যারা হৃৎস্পন্দন নিয়ন্ত্রণ করে। হৃৎপিণ্ডের সংযোগী টিস্যুগুলো হলো–

(ক) **সাইনো-অ্যাট্রিয়াল নোড বা এসএনোড বা পেসমেকার** (Sino-Atrial Node or SAN or SA Node or Pace-maker) **:** ডান অলিন্দের উর্ধ্ব মহাশিরা বা সুপিরিয়র ভেনাক্যাভার কাছে **SAN বা Pace-maker** অবস্থিত এবং এ অংশই হৃৎস্পন্দনের প্রধান উৎসস্থল। **Martin Flack** (1907) এটি আবিষ্কার করেন। এটি **কলা আকৃতির** (banana shaped) গঠন। এগুলো ১০-১৫ mm লম্বা, ৩ mm চওড়া এবং ১ mm পুরু। এটি মিনিটে ৭০-৮০ বার স্পন্দন প্রবাহ সৃষ্টি করে হৃৎপিণ্ডের বাকি অংশের ছন্দকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। তাই SAN-কে **প্রাকৃতিক পেসমেকার বা ছন্দনিয়ামক** বলে। SAN ঘড়ির মতো প্রতি সেকেন্ডে একবার সঙ্কোচিত হয়। হৃৎপিণ্ডকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হলেও এ সঙ্কোচন চলতে থাকে। এ কারণেই হৃৎপিণ্ড সংস্থাপনের সময়ও সচল থাকে। অনেকসময় SAN এর কার্যকারিতা কমে গেলে ক্লান্তি ও শ্বাসকষ্ট অনুভব হয় যাকে **ইশকেমিয়া** (ischaemia) বলা হয়।

(খ) **অ্যাট্রিও-ভেন্ট্রিকুলার নোড বা এভিনোড** (Atrio-Ventricular Node or AVN or AV Node) **:** যে নোড বা পর্ব করোনারি সাইনাসের নিকট আন্তঃঅলিন্দ প্রাচীর বা ইন্টার-অ্যাট্রিয়াল সেপ্টামের পেছনে অবস্থান করে তাকে **AVN বা AV Node** বলে। SAN-এর স্পন্দনপ্রবাহকে গ্রহণ করে এবং নিজেও প্রতি মিনিটে ৪০-৬০ বার স্পন্দনপ্রবাহ সৃষ্টি করতে সক্ষম। AVN-কে **সংরক্ষিত পেসমেকার** বলা হয়, কারণ কোনো কারণে SAN হৃৎস্পন্দন প্রবাহ বা হৃৎউদ্দীপনা বা বৈদ্যুতিক সংকেত (electrical signal) সৃষ্টিতে অক্ষম হলে AVN উহা সৃষ্টি করে।

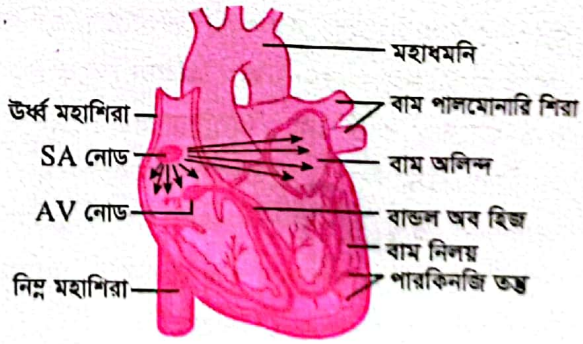

চিত্র ৪.৯ : মানুষের হৃৎপিণ্ডের বিশেষ সংযোগী টিস্যু

(গ) **বান্ডল অব হিজ** (Bundle of His-BH) **বা হিজের বান্ডল :** মিনিটে ৩৬ বার স্পন্দন সৃষ্টিতে সক্ষম AVN থেকে উৎপন্ন যে হৃৎপিণ্ডের সংযোগী কলা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে ডান ও বাম নিলয়ের প্রাচীরে বিস্তৃত এবং AVN থেকে উৎপন্ন স্পন্দনকে নিলয়ের প্রাচীরে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম, তাদের **বান্ডল অব হিজ** বলে।

CamScanner

(ঘ) **পারকিনজি তন্তু** (Purkinje fibre) : যখন বান্ডল অব হিজের শেষপ্রান্ত সূক্ষ্ম তন্তুতে রূপান্তরিত হয়ে নিলয়ের প্যাপিলারি পেশি এবং পার্শ্বপ্রাচীরে বিন্যস্ত থেকে মিনিটে ৩০-৩৫ বার স্পন্দন সৃষ্টিতে সক্ষম ও হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন প্রবাহকে দ্রুত নিলয় পেশিতে ছড়িয়ে দিতে পারে তাদের পারকিনজি তন্তু বলে।

Kitch ও Flack (1907)-এর মত অনুসারে SAN থেকে হৃৎস্পন্দনের সূচনা ঘটে। স্বাভাবিক অবস্থায় SAN-এর ছন্দময় ক্রিয়াকলাপ দ্বারা বিশিষ্ট হৃৎপেশির ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। ডান অলিন্দের প্রাচীরে **সাইনো অ্যাট্রিয়াল নোড** (SAN) থেকে সৃষ্ট একটি **অ্যাকশন পটেনশিয়াল** (action potential) ইলেকট্রিকাল সিগন্যালের মাধ্যমে একটি হৃৎস্পন্দন বা হার্টবিটের শুরু হয়। SAN থেকে উৎপন্ন ইলেকট্রিকাল সিগন্যাল সমগ্র অলিন্দের প্রাচীরে ছড়িয়ে গিয়ে অলিন্দের সংকোচন ঘটায়। SAN থেকে সিগন্যাল **অ্যাট্রিও ভেন্ট্রিকুলার নোড** (AVN) কর্তৃক গৃহীত হয়। AVN কর্তৃক গৃহীত সিগন্যাল অতঃপর বান্ডল অব হিজ নামক বিশেষ হৃৎপেশি সূত্রকে যায়। এখন থেকে সিগন্যাল পারকিনজি সূত্রকের মাধ্যমে নিলয় প্রাচীরে সঞ্চারিত হয় এবং ফলে রক্তপূর্ণ নিলয়ের সংকোচন ঘটে। এভাবে হার্টবিট নিয়ন্ত্রিত হয়। হৃৎপিণ্ডের বিশেষ সংযোগী টিস্যুগুলো দ্বারা বৈদ্যুতিক তরঙ্গ প্রবাহের অনুক্রমটি নিম্নরূপ–

SA নোড → AV নোড → বান্ডল অব হিজ → পারকিনজি তন্তু

SA নোড ও AV নোডের মধ্যে পার্থক্য

SA Node (SAN)	AV Node (AVN)
১। এটি ডান অ্যাট্রিয়ামের সুপিরিয়র ভেনাক্যাভার ছিদ্রের নিকটে অবস্থিত।	১। এটি ডান অ্যাট্রিয়ামের আন্তঃঅ্যাট্রিয়াম পর্দার মূলদেশে অবস্থিত।
২। এর ছন্দময়তা খুব বেশি।	২। এর ছন্দময়তা খুব কম।
৩। এটি স্পন্দনপ্রবাহ সৃষ্টি করে।	৩। এটি SA Node থেকে উৎপন্ন স্পন্দনপ্রবাহ গ্রহণ করে।
৪। একে পেসমেকার বা ছন্দ-নিয়ামক বলে।	৪। একে সংরক্ষী ছন্দ-নিয়ামক বলে।

❑ **কাজ :** (i) হৃৎপিণ্ডের স্বাভাবিক স্পন্দন চাক্রিক গতিতে সম্পন্ন হয়– বিশ্লেষণ কর। (ii) হৃৎপিণ্ড স্নায়ু উদ্দীপনা ছাড়াই স্বয়ংক্রিয়ভাবে কার্যসম্পাদনে সক্ষম– যুক্তি সহকারে ব্যাখ্যা কর। (iii) হৃৎপিণ্ডের স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণকারী নোডসমূহের কার্যাবলি ব্যাখ্যা কর।

৪.৫ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে ব্যারোরিসেপ্টরের ভূমিকা
(Role of Baroreceptor for controlling Blood Pressure)

রক্তচাপ (Blood Pressure)

প্রবহমান রক্ত হৃৎপিণ্ড থেকে দেহের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রবাহিত হওয়ার সময় রক্তবাহিকার প্রাচীরে যে পার্শ্বীয় চাপ প্রয়োগ করে তাকে **রক্তচাপ** বা **ব্লাড প্রেসার** বলে। রক্তচাপ বলতে সাধারণভাবে ধমনির প্রাচীরের রক্তচাপকেই বোঝায়। হৃৎপিণ্ডের কাছাকাছি ধমনিতে রক্তচাপ সবচেয়ে বেশি এবং এ চাপ দূরবর্তী ধমনিতে ক্রমশ কমে যায়। শিরায় রক্তচাপ খুবই কম। দেহে রক্তের পরিমাণ, হৃৎপিণ্ড থেকে নিষ্কৃত রক্তের পরিমাণ, রক্তের সান্দ্রতা এবং ধমনির স্থিতিস্থাপকতা রক্তচাপকে প্রভাবিত করে। হৃৎপিণ্ডের সংকোচনকে **সিস্টোল** (systole) এবং প্রসারণকে **ডায়াস্টোল** (diastole) বলে। **স্ফিগমোম্যানোমিটার** (Sphygmomanometer) যন্ত্রের সাহায্যে রক্তচাপ নির্ণয় করা যায়। রক্তচাপ দুই ধরনের, যথা–

(ক) **সিস্টোলিক চাপ** (Systolic pressure) : হৃৎপিণ্ডের সিস্টোল অবস্থায় ধমনিতে যে চাপ থাকে তাকে সিস্টোলিক চাপ বলে। প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ মানুষের এই রক্তচাপ ১১০-১৪০ mm Hg।

(খ) **ডায়াস্টোলিক চাপ** (Diastolic pressure) : হৃৎপিণ্ডের ডায়াস্টোল অবস্থায় ধমনিতে যে চাপ থাকে তাকে ডায়াস্টোলিক চাপ বলে। প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ মানুষের এই রক্তচাপ ৬০-৯০ mm Hg।

CamScanner

উচ্চ রক্তচাপ (Hypertension)

নির্দিষ্ট বয়সে মানুষের সুস্থ শরীরে যে রক্তচাপ থাকা দরকার তার চেয়ে বেশি পরিমাণের রক্তচাপ সর্বদা বিদ্যমান থাকলে তাকে **উচ্চ রক্তচাপ** বা **হাইপারটেনশন** বলে। নির্দিষ্ট বয়সে স্বাভাবিক যে রক্তচাপ থাকা দরকার তার চেয়ে যদি বেশি থাকে বা কম থাকে তবে রোগের নির্দেশ করে। রক্তচাপ বেশি হলে তাকে **উচ্চ রক্তচাপ** ও কম হলে তাকে **নিম্ন রক্তচাপ** বলে। সিস্টোলিক ও ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ যথাক্রমে ১৪০ ও ৯০ mm Hg-এর বেশি হলে তাকে **উচ্চ রক্তচাপ** হিসেবে গণ্য করা হয়। উত্তেজনা, চিন্তা, বিষণ্নতা, নিদ্রাহীনতা বা অন্য কোনো কারণে যদি রক্তচাপ সাময়িকভাবে নির্দিষ্ট সীমানা অতিক্রম করে তবে তাকে হাইপারটেনশন বলা যাবে না এবং এ অবস্থায় কোনো ওষুধেরও প্রয়োজন হয় না।

মানুষের উচ্চ রক্তচাপ দেখা দেওয়ার কারণ : (১) বংশগতীয় উত্তরাধিকার হিসেবে প্রাপ্ত। (২) অতিরিক্ত চর্বিযুক্ত খাবার গ্রহণের ফলে রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে। (৩) বৃক্ক সংক্রমণের কারণে বৃক্কের রক্ত পরিশোধন ক্ষমতা হ্রাস পেলে। (৪) অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির অস্বাভাবিকতার কারণে অ্যাডরেনালিন, অ্যালডোস্টেরন ও গ্লুকোকর্টিকয়েড হরমোনের ক্ষরণ বেড়ে গিয়ে রক্তের সোডিয়াম আয়নের মাত্রা বৃদ্ধি পেলে। (৫) অতিরিক্ত শারীরিক ওজন, মেদবহুল শরীর। (৬) অপর্যাপ্ত কায়িক পরিশ্রম। (৭) ধূমপান, মদ্যপান বা অন্য কোনো নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবন। (৮) মানসিক বিষণ্নতা, নিদ্রাহীনতা, চাপ, ডায়াবেটিস ইত্যাদি।

উচ্চ রক্তচাপজনিত রোগ বা সমস্যা : উচ্চ রক্তচাপ বা হাইপারটেনশন আধুনিক বিশ্বের একটি মারাত্মক রোগ। নিম্ন রক্তচাপ উচ্চ রক্তচাপের মতো তত মারাত্মক নয়। তবে রক্তচাপ যথেষ্ট কমে গেলে নানা রকম অসুবিধা হয়। উচ্চ রক্তচাপের কারণে মানবদেহে নানারকম সমস্যা দেখা দিতে পারে, তার মধ্যে রয়েছে– স্ট্রোক (stroke), প্যারালাইসিস, হৃৎপিণ্ড বড় হয়ে যাওয়া, হার্ট অ্যাটাক ও হার্ট ফেইলিউর, অ্যানজাইনা, বৃক্কের কার্যক্ষমতা হ্রাস পাওয়া, দৃষ্টিশক্তির ব্যাঘাত (দৃষ্টিক্ষীণতা, প্যাপিলিওডিমা ও অন্ধত্ব) প্রভৃতি।

উচ্চ রক্তচাপের প্রতিরোধ : রক্তচাপ প্রতিরোধ করার জন্য কিংবা প্রতিকার হিসেবে নিম্নলিখিত সতর্কতামূলক উপায়গুলো পালনের মাধ্যমে উপকার পাওয়া যায় :

(১) দেহের ওজন বৃদ্ধি না করা। (২) নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম করা, হাঁটা, ব্যায়াম করা এবং খেলাধুলার অভ্যাস করা। (৩) চর্বিযুক্ত খাবার বর্জন করা। (৪) সুষম খাদ্য গ্রহণ করা। (৫) পরিমাণের অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকা। (৬) ধূমপান, মদ্যপান ও অন্য যেকোনো নেশা হতে বিরত থাকা। (৭) নিয়মিত দৈনিক ৭-৮ ঘণ্টা ঘুমানো। (৮) মানসিক চাপমুক্ত ও দুশ্চিন্তামুক্ত জীবন যাপন করা। (৯) খাবারের সঙ্গে অতিরিক্ত লবণ গ্রহণ থেকে বিরত থাকা। (১০) নিয়মিত ডাক্তারের পরামর্শে ওষুধ সেবন করে উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে আনা।

ব্যারোরিসেপ্টর (Baroreceptor)

রক্তনালির প্রাচীরে বিদ্যমান কতগুলো সংবেদী স্নায়ুপ্রান্ত, যা রক্তচাপ পরিবর্তনে বিশেষভাবে সাড়া দেয়। সেই স্নায়ুপ্রান্তকে ব্যারোরিসেপ্টর (baroreceptor) **বলে**। এগুলো মস্তিষ্কের **ভেগাস স্নায়ু** ও **গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল স্নায়ু** থেকে সৃষ্টি হয় এবং রক্তচাপ পরিবর্তনে সাড়া দিয়ে দেহে রক্তচাপের ভারসাম্য (বা হোমিওস্টেসিস) বজায় রাখে। রক্তনালিতে কোনো কারণে অস্বাভাবিক রক্তচাপ সৃষ্টি হলে ব্যারোরিসেপ্টর খুব দ্রুত এ উদ্দীপনা গ্রহণ করে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে প্রেরণ করে। এরপর কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র রক্তনালি ও হৃৎপিণ্ড পরিচালনার মাধ্যমে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে। এ পদ্ধতিকে **ব্যারোরিফ্লেক্স** (baroreflex) বলে।

ব্যারোরিসেপ্টর দু'প্রকার, যথা : **(১) উচ্চচাপ ব্যারোরিসেপ্টর** (high-pressure baroreceptor) বা **আর্টারিয়াল ব্যারোরিসেপ্টর** (arterial baroreceptor) এবং **(২) নিম্নচাপ ব্যারোরিসেপ্টর** (low-pressure baroreceptor) বা **আয়তন ব্যারোরিসেপ্টর** (volume baroreceptor) বা **কার্ডিওপালমোনারি ব্যারোরিসেপ্টর** (cardiopulmonary baroreceptor)।

(১) উচ্চচাপ ব্যারোরিসেপ্টর (High-Pressure Baroreceptor) **: ক্যারোটিড সাইনাস ও অ্যাওর্টিক আর্চের** প্রাচীর গাত্রে এই জাতীয় রিসেপ্টরগুলো অবস্থান করে। হৃৎপিণ্ডে রক্তচাপের পরিবর্তন ঘটলে এই পরিবর্তন রক্তনালির প্রাচীরে সঞ্চালিত হয়। এই সঞ্চালনের ফলে সেন্সর তথা ব্যারোরিসেপ্টরগুলো উদ্দীপ্ত হয়। ব্যারোরিসেপ্টর রক্তনালির গাত্রে রক্তচাপ স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিকতা অনুধাবন করে এবং তা স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে প্রেরণ করে, ফলে প্রতিবর্ত ক্রিয়ায় কিছুক্ষণের মধ্যে হৃৎস্পন্দনের মাত্রা অস্বাভাবিক অবস্থা থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে।

CamScanner

দেহে যখন রক্তচাপ কমে যায় তখন ব্যারোরিসেপ্টরের সংকেত মাত্রা কমে যায়। এই তথ্য **গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল** ও **ভেগাস স্নায়ুর** মাধ্যমে মস্তিষ্কের **মেডুলা অবলংগাটায়** পৌঁছে। মেডুলা অবলংগাটার তথ্যগুলো হৃৎপেশি দেহের আর্টারিওল ও শিরায় প্রেরণ করে। ফলে আর্টারিওল ও শিরা সংকুচিত হয় এবং সামগ্রিক প্রান্তীয় প্রতিরোধ বেড়ে যায়। ফলে রক্তচাপ স্বাভাবিক হয়ে আসে।

- **রক্তচাপ কমে গেলে :** ব্যারোরিসেপ্টরের সংকেত প্রদানের মাত্রা কমে যায় → এই তথ্য মস্তিষ্কের মেডুলা অবলংগাটায় পৌঁছে → মেডুলা অবলংগাটা থেকে তথ্য রক্তনালিতে পৌঁছে এবং রক্তনালির সংকোচন ঘটায় → রক্তচাপ স্বাভাবিক হয়।
- **রক্তচাপ বেড়ে গেলে :** ব্যারোরিসেপ্টরের সংকেত প্রদানের মাত্রা বেড়ে যায় → ফলে হৃৎস্পন্দন ও রক্তনালির ক্রিয়া কমে যায় → সংকেত প্রদান বন্ধ হয়ে গেলে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র হৃৎস্পন্দন ও রক্তনালির ক্রিয়া বাড়িয়ে দেয় → ফলে রক্তনালির প্রসারণ ঘটে → রক্তচাপ কমে যায়। ব্যারোরিসেপ্টরগুলো খুব অল্প সময়ের জন্য রক্তচাপ বৃদ্ধিতে সাড়া দেয়। দীর্ঘ সময় ধরে রক্তচাপ উচ্চ মাত্রায় থাকলে ব্যারোরিসেপ্টর এটাকে স্বাভাবিক মনে করে। এর **ফলে স্থায়ী উচ্চ রক্তচাপ** (hypertension) **সৃষ্টি হয়**।

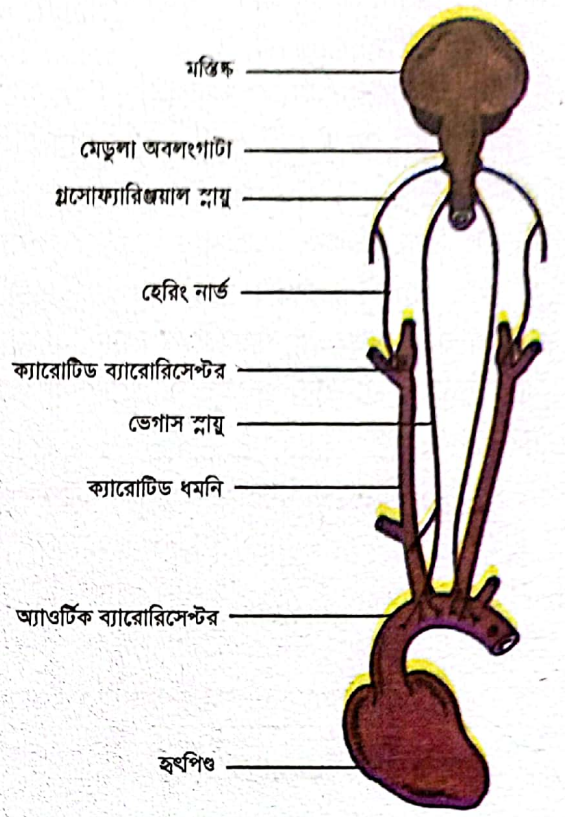

চিত্র ৪.১০ : অ্যাওর্টিক ব্যারোরিসেপ্টর এবং ক্যারোটিড ব্যারোরিসেপ্টর

(২) নিম্নচাপ ব্যারোরিসেপ্টর বা আয়তন রিসেপ্টর (Low-Pressure Baroreceptor/Volume Baroreceptor) : এই রিসেপ্টরগুলো বড় **সিস্টেমিক শিরা, পালমোনারি শিরা** এবং হৃৎপিণ্ডের **ডান অলিন্দ** ও **নিলয়ের প্রাচীরে** অবস্থান করে। এরা রক্তের আয়তন নিয়ন্ত্রণ করে বলে এদেরকে **ভলিউম** বা **আয়তন রিসেপ্টর** বলে। রক্তসংবহন ছাড়াও রেচনে বিশেষত মূত্র নিষ্কাশনে এরা বিশেষ ভূমিকা পালন করে। নিম্নচাপ ব্যারোরিসেপ্টর বৃক্কের হরমোন উৎপাদনের পরিবর্তন এনে রক্তের পানি ও লবণ ধরে রাখায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। রক্তের লবণ ও পানির মাত্রা রক্তচাপের ওপর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলে।

হৃৎপিণ্ডে রক্তের আয়তন হ্রাস পেলে আয়তন রিসেপ্টর এ সংকেত মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাসে প্রেরণ করে। এই সংকেত পেয়ে হাইপোথ্যালামাসের পিটুইটারি গ্রন্থির নিউরোহাইপোফাইসিস থেকে **অ্যান্টিডাইইউরেটিক হরমোন** (antidiuretic hormone-ADH) বা ব্যাসোপ্রেসিন ক্ষরণ শুরু হয়। ক্ষরিত ADH বৃক্কে পৌঁছালে বৃক্কে অল্প পরিমাণ মূত্র তৈরি করে। ফলে রক্তে পানির পরিমাণ ঠিক থাকে ও রক্তের স্বাভাবিক আয়তন বজায় থাকে। এছাড়াও রক্তের আয়তন হ্রাস পেলে সিমপ্যাথেটিক স্নায়ু উদ্দীপ্ত হয়। উদ্দীপ্ত স্নায়ু **রেনিন** (renin) ক্ষরণের জন্য বৃক্কে সংকেত পাঠায়। রেনিন এনজাইমের প্রভাবে **অ্যানজিওটেনসিন** (angiotensin) হরমোন সক্রিয় হয়, ফলে রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়।

৪.৬ মানবদেহে রক্তসংবহন পদ্ধতি (Process of Blood Circulation in Human body)

মানবদেহের রক্ত সংবহনতন্ত্র **রক্ত, হৃৎপিণ্ড** ও **রক্তবাহিকা** নিয়ে গঠিত। মানবদেহের রক্ত সংবহনতন্ত্র বদ্ধ প্রকৃতির (closed type) অর্থাৎ রক্ত হৃৎপিণ্ড ও রক্তবাহিকার (ধমনি, শিরা ও কৈশিকনালি) মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে অভ্যন্তরীণ পরিবহন সম্পন্ন করে। মানুষের হৃৎপিণ্ডের মধ্য দিয়ে ২টি বর্তনী বা চক্রের মাধ্যমে রক্ত প্রবাহিত হয়, যথা : **সিস্টেমিক চক্র** (systemic cycle) এবং **পালমোনারি চক্র** (pulmonary cycle)। এ ধরনের দ্বি-চক্রীয় সংবহনকে **দ্বি-বর্তনী বা দ্বি-চক্রীয় সংবহন** (double circuit circulation) বলা হয়। রক্ত প্রবাহের মাত্রা দেহের বিভিন্ন কলায় ভিন্নরকম পরিলক্ষিত হয়। যকৃতে রক্ত সর্বাধিক মাত্রায় (1350 ml/min) প্রবাহিত হয়। অতঃপর বৃক্ক (1100 ml/min) ও মস্তিষ্কে (700 ml/min) যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় মাত্রায় রক্ত প্রবাহিত হয়।

CamScanner

মানবদেহে সাধারণত চার পদ্ধতিতে রক্তসংবহন সংঘটিত হয়, যথা– (১) সিস্টেমিক সংবহন, (২) পালমোনারি সংবহন, (৩) পোর্টাল সংবহন ও (৪) করোনারি সংবহন।

১। সিস্টেমিক সংবহন (Systemic circulation) : বাম ভেন্ট্রিকল থেকে শুরু করে দেহের বিভিন্ন অংশ হতে ডান অ্যাট্রিয়ামে পৌঁছানো পর্যন্ত রক্তসংবহনকে সিস্টেমিক বা তন্ত্রীয় সংবহন বলে। এই সংবহনের মাধ্যমে দেহের সকল কোষ, টিস্যু এবং অঙ্গে O_2 সমৃদ্ধ রক্ত সরবরাহ হয় এবং CO_2 যুক্ত রক্ত হৃৎপিণ্ডে ফেরত আসে। হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত প্রবাহিত হয়ে পুনরায় হৃৎপিণ্ডে ফেরত আসতে সিস্টেমিক সার্কিটের সময় লাগে ২৫-৩০ সেকেন্ড। এই সংবহনকে **আর্টেরিওল** এবং ভেনাস ডিভিশনে ভাগ করা যায়। সিস্টেমিক সংবহনের **আর্টেরিওল ডিভিশনের** শুরু হয় অ্যাওর্টা থেকে, আর অ্যাওর্টার উদ্ভব ঘটে বাম ভেন্ট্রিকল থেকে। বাম ভেন্ট্রিকলের সংকোচনের ফলে রক্ত অ্যাওর্টায় প্রবেশ করে। অ্যাওর্টা অতঃপর অ্যাওর্টিক আর্চ হিসেবে বক্ষ এবং উদরের মাঝ বরাবর অগ্রসর হয়ে সাধারণ **ইলিয়াক ধমনিতে** বিভক্ত হয় যারা দেহের নিম্নাংশে পা পর্যন্ত রক্ত সরবরাহ করে। এরা সকলেই ধমনি, ধমনিকার (arteriole) মাধ্যমে দেহস্থ কৈশিক জালক বা ক্যাপিলারিতে (capillary) উপস্থিত হয়।

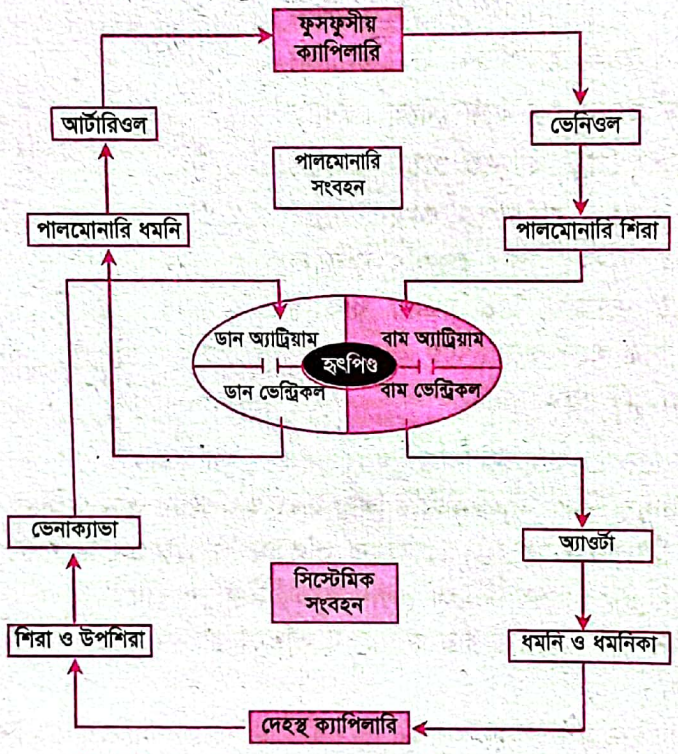

চিত্র ৪.১১ : সিস্টেমিক সংবহনের ও পালমোনারি সংবহনের ডায়াগ্রামাটিক চিত্র

সিস্টেমিক সংবহনের **ভেনাস ডিভিশন** ক্যাপিলারি দ্বারা আর্টেরিওল সিস্টেমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। দেহের উপরের অংশের ভেনাস রক্ত শেষ পর্যন্ত সুপিরিয়র ভেনাক্যাভা এবং পেলভিস, উদরসহ দেহের নিম্নাংশের রক্ত ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভা দ্বারা সংগৃহীত হয়। উভয় ভেনাক্যাভা এদের CO_2 যুক্ত রক্ত হৃৎপিণ্ডের ডান অ্যাট্রিয়ামে প্রদান করে এবং পরবর্তীতে রক্ত ডান ভেন্ট্রিকলে ফিরে আসে। হৃৎপিণ্ডের প্রাচীরের রক্ত করোনারি সাইনাস দ্বারা সংগ্রহ হয় এবং এটি সিস্টেমিক সংবহনের ভেনাস ডিভিশনের অন্তর্গত। একে **গ্রেটার সংবহন** বা প্রান্তীয় সংবহনও বলা হয়।

সিস্টেমিক সংবহনের গতিপথ হলো:

বাম ভেন্ট্রিকল ⟶ অ্যাওর্টা ⟶ টিস্যু ও অঙ্গ ⟶ ভেনাক্যাভা ⟶ ডান অ্যাট্রিয়াম ⟶ ডান ভেন্ট্রিকল

কাজ : সিস্টেমিক সংবহনের রক্ত দেহকোষের চারপাশে অবস্থিত ক্যাপিলারি অতিক্রমকালে কোষে অক্সিজেন, খাদ্যসারসহ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ হয়। একই সঙ্গে কোষে সৃষ্ট বর্জ্য কোষ থেকে অপসারিত হয়।

২। পালমোনারি সংবহন (Pulmonary circulation) : যে সংবহনে রক্ত ডান ভেন্ট্রিকল থেকে ফুসফুসে গমন করে এবং ফুসফুস থেকে বাম অ্যাট্রিয়ামে পুনরায় ফেরত আসে তাকে পালমোনারি সংবহন বলে। পালমোনারি সংবহন শুরু হয় পালমোনারি ধমনি থেকে, আর পালমোনারি ধমনির উদ্ভব হয় ডান ভেন্ট্রিকল থেকে। ডান ভেন্ট্রিকলের সংকোচনের ফলে CO_2 সমৃদ্ধ রক্ত পালমোনারি ধমনিতে প্রবেশ করে। অতঃপর রক্ত ধমনিকা হয়ে

ফুসফুসের অ্যালভিওলাসের চারপাশে অবস্থিত ক্যাপিলারিতে উপস্থিত হয়। ফুসফুসীয় ক্যাপিলারি থেকে O_2 সমৃদ্ধ রক্ত পুনরায় ভেনিউল, ক্ষুদ্রতর শিরা এবং অবশেষে ৪টি (প্রতিটি ফুসফুস থেকে ২টি) **পালমোনারি শিরার** মাধ্যমে বাম অ্যাট্রিয়ামে ফেরত আসে এবং রক্ত পরে বাম ভেন্ট্রিকলে প্রবেশ করে।

পালমোনারি সংবহনের গতিপথ হলো :

ডান ভেন্ট্রিকল ⟶ পালমোনারি ধমনি ⟶ ফুসফুস ⟶ পালমোনারি শিরা ⟶ বাম অ্যাট্রিয়াম ⟶ বাম ভেন্ট্রিকল

কাজ : এই সংবহনের মাধ্যমে CO_2 সমৃদ্ধ রক্ত ফুসফুসে গমন করে এবং অ্যালভিওলাস অতিক্রমকালে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় গ্যাসের বিনিময় ঘটে। ফলে O_2 সমৃদ্ধ রক্ত হৃৎপিণ্ডে ফেরত আসে।

সিস্টেমিক সংবহন ও পালমোনারি সংবহনের মধ্যে পার্থক্য

সিস্টেমিক সংবহন	পালমোনারি সংবহন
১। রক্তের গতিপথ হলো বাম ভেন্ট্রিকল থেকে দেহ টিস্যু এবং দেহ টিস্যু থেকে ডান অ্যাট্রিয়াম।	১। রক্তের গতিপথ হলো ডান ভেন্ট্রিকল থেকে ফুসফুস এবং ফুসফুস থেকে বাম অ্যাট্রিয়াম ।
২। বাম ভেন্ট্রিকল থেকে শুরু হয়ে দেহ টিস্যু অতিক্রম করে ডান অ্যাট্রিয়ামে শেষ হয়।	২। ডান ভেন্ট্রিকল থেকে শুরু হয়ে ফুসফুস অতিক্রম করে বাম অ্যাট্রিয়ামে শেষ হয়।
৩। এই সংবহনে ধমনি অক্সিজেনেটেড রক্ত এবং শিরা ডিঅক্সিজেনেটেড রক্ত পরিবহন করে।	৩। এই সংবহনে পালমোনারি ধমনি ডি-অক্সিজেনেটেড রক্ত এবং পালমোনারি শিরা অক্সিজেনেটেড রক্ত পরিবহন করে।
৪। দেহ টিস্যুতে নিউট্রিয়েন্ট সরবরাহ করে ।	৪। অক্সিজেন সংগ্রহের জন্য ফুসফুসে গমন করে।
৫। রক্তচাপ অধিক।	৫। রক্তচাপ তুলনামূলকভাবে কম।

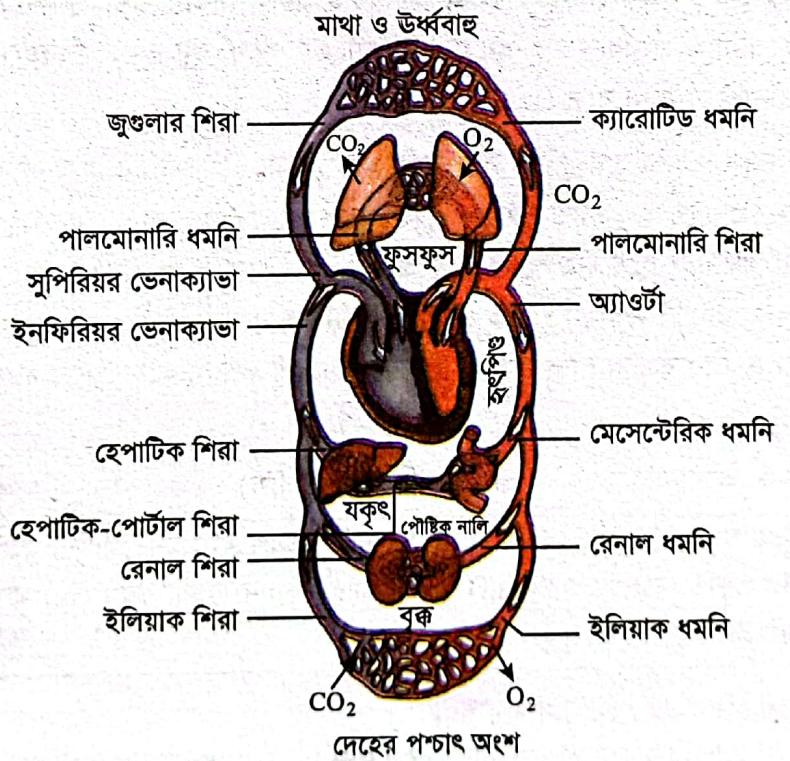

চিত্র ৪.১২ : মানবদেহের রক্তসংবহন

৩। **পোর্টাল সংবহন** (Portal circulation) : দেহের কোনো অঙ্গ বা অংশের কৈশিক জালিকা থেকে উৎপন্ন হয়ে যে শিরা হৃৎপিণ্ডের দিকে অগ্রসর হওয়ার পথে হৃৎপিণ্ডে না পৌঁছে দেহের অন্য কোনো মাধ্যমিক অঙ্গে প্রবেশ করে এবং সেখানে পুনরায় কৈশিক জালিকায় বিভক্ত হয় তাকে **পোর্টাল শিরা** বলে। পোর্টাল শিরার মাধ্যমে রক্তসংবহন ব্যবস্থাকে **পোর্টাল সংবহন** বলে। মেরুদণ্ডী প্রাণীতে সাধারণত **যকৃৎ বা হেপাটিক পোর্টালতন্ত্র** (hepatic portal system) এবং **বৃক্কীয় বা রেনাল পোর্টাল তন্ত্র** (renal portal system) থাকে। মানুষের প্রধানত **হেপাটিক পোর্টালতন্ত্র** থাকে কিন্তু **রেনাল পোর্টাল তন্ত্র** থাকে না।

CamScanner

পাকস্থলী থেকে গ্যাস্ট্রিক শিরা, স্প্লিন থেকে স্প্লিনিক শিরা, অন্ত্র থেকে আন্ত্রিক শিরা, সিকাম থেকে সিকাল শিরা এবং রেকটাম থেকে রেকটাল শিরাগুলো মিলিত হয়ে **যকৃৎ বা হেপাটিক পোর্টাল শিরা** (hepatic portal vein) গঠন করে। যকৃৎ পোর্টাল শিরা কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পর দুটি শাখায় ভাগ হয় এবং অবশেষে যকৃতে প্রবেশ করে পুনরায় কৈশিক জালকে পরিণত হয়। যকৃতের কৈশিক জালক হতে উৎপন্ন যকৃৎ শিরার মাধ্যমে রক্ত ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভায় বা নিম্ন মহাশিরায় পৌঁছে এবং সেখান থেকে হৃৎপিণ্ডের ডান অ্যাট্রিয়ামে প্রবেশ করে। পোর্টাল শিরা সমন্বয়ে গঠিত এই সংবহনকে **পোর্টাল সংবহন** বলে। **পোর্টাল সংবহন এক প্রকার সিস্টেমিক সংবহন।**

যকৃৎ পোর্টাল সংবহনের প্রয়োজনীয়তা : (১) পৌষ্টিকনালি থেকে শোষিত সরল খাদ্য (গ্লুকোজ, অ্যামিনো এসিড, ফ্যাটি এসিড ইত্যাদি) পোর্টাল সংবহনের মাধ্যমে যকৃতে আসে। সেখানে অতিরিক্ত গ্লুকোজ গ্লাইকোজেনে পরিণত হয়ে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চিত হয়। দেহকোষে গ্লুকোজের অভাব ঘটলে গ্লাইকোজেন পুনরায় গ্লুকোজে পরিণত হয়ে রক্তে প্রবাহিত হয়। (২) দূষিত নাইট্রোজেনঘটিত পদার্থ অ্যামোনিয়া যকৃতে ইউরিয়ায় পরিণত হয়ে বৃক্কের মাধ্যমে দেহের বাইরে নির্গত হয়। ফলে রক্ত পরিশুদ্ধ হয়। (৩) যকৃৎ রক্তে প্রোটিন উৎপাদন করে রক্তে সরবরাহ করে।

পোর্টাল সংবহনের গতিপথ হলো :

পৌষ্টিক অঙ্গাদি ⟶ হেপাটিক পোর্টাল শিরা ⟶ যকৃৎ ⟶ হেপাটিক শিরা ⟶ ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভা ⟶ ডান অ্যাট্রিয়াম

৪। করোনারি সংবহন (Coronary circulation) **:** রক্ত সংবহনতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো হৃৎপিণ্ডের উপস্থিতি। সজীব সংকোচনশীল হৃৎপিণ্ডের পাম্পিং (pumping) কৌশলের মাধ্যমে সমগ্র দেহে রক্ত সংবাহিত হয়। কিন্তু হৃৎপিণ্ড নিজেই দেহের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। দেহে অবিরাম রক্তপ্রবাহ বহাল রাখার জন্য হৃৎপিণ্ডের নিজের জন্য পুষ্টি এবং অক্সিজেন প্রয়োজন। করোনারি সংবহনের মাধ্যমে এই চাহিদা পূরণ হয়। যে সংবহনে রক্ত হৃৎপিণ্ডের প্রাচীরে সংবাহিত হয় তাকে **করোনারি সংবহন** বলে।

হৃৎপিণ্ডের প্রাচীরে সরাসরি হৃৎগহ্বর থেকে রক্ত সঞ্চারিত হয় না। সিস্টেমিক ধমনির গোড়া হতে সৃষ্ট করোনারি ধমনির মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের প্রাচীরে O_2 সমৃদ্ধ রক্ত সংবাহিত হয়। হৃৎপিণ্ডের প্রাচীর হতে CO_2 সমৃদ্ধ রক্ত করোনারি শিরার মাধ্যমে করোনারি সাইনাস হয়ে হৃৎপিণ্ডের ডান অ্যাট্রিয়ামে ফিরে আসে। অর্থাৎ এই ধরনের সংবহন হৃৎপেশি ও হৃৎপিণ্ডের মধ্যে ঘটে। **করোনারি সংবহনও এক প্রকার সিস্টেমিক সংবহন।** করোনারি সংবহনের মাধ্যমে প্রায় ৩৮০ লিটার (১০০ গ্যালন) বা হৃৎপিণ্ড কর্তৃক পাম্পকৃত সম্পূর্ণ রক্তের প্রায় ৫% রক্ত হৃৎপিণ্ডে পাম্প হয়।

করোনারি সংবহনের গতিপথ :

সিস্টেমিক ধমনি ⟶ করোনারি ধমনি ⟶ হৃৎপ্রাচীর (হৃৎপেশি) ⟶ করোনারি শিরা ⟶ ডান অ্যাট্রিয়াম

❑ **কাজ :** (i) দেহে রক্তচাপ ১৭৫/১১০ হলে তাকে কী ধরনের রক্তচাপ বলা হয়– ব্যাখ্যা কর। (ii) টাকি মাছের এবং মানুষের রক্ত সংবহন দুটির প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর। (iii) পালমোনারি সংবহন ব্যাখ্যা কর। (iv) মাছ ও মানুষের রক্ত সংবহন পদ্ধতি পরস্পর থেকে ভিন্নতর– বিশ্লেষণ কর।

রক্তবাহিকা (Blood Vessels) [প্রাসঙ্গিক বিষয়]

মানুষের পুরো শরীরে জালের মতো ছড়িয়ে থাকা যেসব নালিকার মাধ্যমে রক্ত হৃৎপিণ্ড থেকে দেহের বিভিন্ন তন্ত্র, অঙ্গ, কলা ও কোষে বাহিত হয় এবং দেহের ঐসব স্থান হতে রক্ত হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে তাদের **রক্তবাহিকা** (blood vessels) বলে। তিন ধরনের রক্তবাহিকা দ্বারা মানবদেহে রক্ত পরিবাহিত হয়, যথা– **ধমনি, শিরা ও কৈশিক জালিকা।**

ধমনি (Artery) **:** যেসব রক্ত নালিকার মাধ্যমে O_2 সমৃদ্ধ রক্ত হৃৎপিণ্ড থেকে দেহের বিভিন্ন অংশে প্রেরিত হয় তাদের ধমনি বলে (ব্যতিক্রম– পালমোনারি ধমনি)। ধমনির প্রাচীর বেশ পুরু, মজবুত ও স্থিতিস্থাপক। এর প্রাচীর তিনটি স্তর নিয়ে গঠিত। বাইরের স্তরটি যোজক কলা নির্মিত **টিউনিকা এক্সটার্না বা টিউনিকা এডভেনটিশিয়া** (tunica externa or tunica adventitia), মাঝের স্তরটি পেশিকলা নির্মিত **টিউনিকা মিডিয়া** (tunica media) এবং ভেতরের

স্তরটি এন্ডোথেলিয়াম কলা নির্মিত **টিউনিকা ইন্টিমা** (tunica intima)। ধমনির কেন্দ্রের ছিদ্র বা **লুমেন** ছোট; এতে কপাটিকা থাকে না। ধমনি দিয়ে উচ্চচাপে রক্ত প্রবাহিত হয়। **হৃৎপিণ্ড থেকে উৎপন্ন হয়ে ধমনি দেহের বিভিন্ন অংশে শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে কৈশিক জালিকাতে পরিসমাপ্তি ঘটায়।**

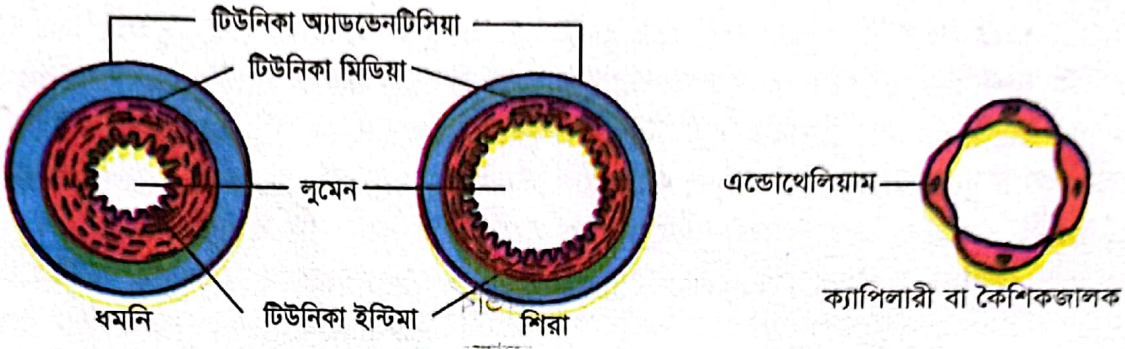

চিত্র ৪.১৩ : রক্তবাহিকা

শিরা (Vein) : যেসব রক্তনালিকার মাধ্যমে CO_2 সমৃদ্ধ রক্ত দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে তাদের শিরা বলে (ব্যতিক্রম– পালমোনারি শিরা)। শিরার প্রাচীর ধমনির মতো তিনস্তর বিশিষ্ট হলেও এটি পাতলা, পেশিবিহীন ও কম স্থিতিস্থাপক। এদের লুমেন বড় এবং কপাটিকাযুক্ত। **সকল শিরাই কৈশিক জালিকা থেকে সৃষ্টি হয়ে হৃৎপিণ্ডে শেষ হয়।**

কৈশিক জালিকা (Capillary) : কোষ-কলার ফাঁকে ফাঁকে জালিকার ন্যায় বিস্তৃত, সূক্ষ্ম প্রাচীরবিশিষ্ট, অতি সরু আণুবীক্ষণিক রক্তনালিকাকে **কৈশিক জালিকা** বলে। এদের প্রাচীর একস্তরী এন্ডোথেলিয়াম দ্বারা গঠিত। **এরা প্রশাখা-ধমনি ও শিরার সংযোগস্থলে জালিকাকারে বিন্যস্ত থাকে।** এদের প্রাচীর সূক্ষ্ম হওয়াতে রক্ত ও কলারসের মধ্যে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় খাদ্যরস, রেচন বর্জ্য, শ্বসন গ্যাস ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির বিনিময় ঘটে।

ধমনি ও শিরার মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	ধমনি	শিরা
১। উৎপত্তি ও সমাপ্তি	হৃৎপিণ্ডে উৎপন্ন হয়ে দেহের কৈশিকনালিতে সমাপ্ত হয়।	কৈশিকনালি থেকে উৎপন্ন হয়ে হৃৎপিণ্ডে সমাপ্ত হয়।
২। রক্ত প্রবাহের দিক	হৃৎপিণ্ড থেকে দেহের দিকে পরিবহন করে।	দেহ থেকে হৃৎপিণ্ডের দিকে পরিবহন করে।
৩। রক্তের প্রকৃতি	পালমোনারি ধমনি ব্যতীত অন্য ধমনিগুলো O_2 সমৃদ্ধ রক্ত পরিবহন করে। রক্ত উজ্জ্বল লাল বর্ণের।	পালমোনারি শিরা ব্যতীত অন্য শিরাগুলো CO_2 সমৃদ্ধ রক্ত পরিবহন করে। রক্ত কালচে বর্ণের।
৪। প্রাচীর	বেশ পুরু ও স্থিতিস্থাপক।	কম পুরু ও অস্থিতিস্থাপক।
৫। লুমেন (গহ্বর)	লুমেন ছোট ।	লুমেন বড়।
৬। কপাটিকা	কপাটিকা থাকে না।	সেমিলুনার কপাটিকার মতো কপাটিকা থাকে।
৭। অবস্থান	প্রধানত দেহের গভীর অংশে বিস্তৃত থাকে।	দেহের পরিধি অংশে বিস্তৃত থাকে।
৮। রক্তচাপ	উচ্চ চাপে রক্ত পরিবহন করে।	কম চাপে রক্ত পরিবহন করে।
৯। স্পন্দন	ধমনির স্পন্দন আছে।	শিরার স্পন্দন নেই।
১০। খাদ্যসার	অধিক খাদ্যসার সম্পন্ন রক্ত পরিবহন করে।	হেপাটিক পোর্টাল শিরা ব্যতীত কম খাদ্যসার সম্পন্ন রক্ত পরিবহন করে।
১১। বর্জ্য পদার্থ	রক্তে কম বর্জ্য থাকে।	রক্তে বেশি বর্জ্য থাকে।

পালমোনারি ধমনি ও পালমোনারি শিরার মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	পালমোনারি ধমনি	পালমোনারি শিরা
১। উৎপত্তিস্থল	হৃৎপিণ্ডের ডান নিলয় বা ডান ভেন্ট্রিকল।	ফুসফুসের কৈশিক জালক।
২। পরিসমাপ্তি	ফুসফুসের কৈশিক জালক।	হৃৎপিণ্ডের বাম অলিন্দ বা বাম অ্যাট্রিয়াম।
৩। প্রাচীর	পুরু এবং স্থিতিস্থাপক।	পাতলা এবং অস্থিতিস্থাপক।
৪। হৃৎপিণ্ডের সংযোগস্থলে কপাটিকা	থাকে।	থাকে না।
৫। রক্তচাপ	বেশি।	কম।
৬। কাজ	CO_2 সমৃদ্ধ রক্ত O_2 সমৃদ্ধ হওয়ার জন্য হৃৎপিণ্ডের ডান নিলয় থেকে ফুসফুসে নিয়ে যায়।	O_2 সমৃদ্ধ রক্ত ফুসফুস থেকে দেহে সরবরাহের জন্য হৃৎপিণ্ডের বাম অলিন্দে নিয়ে যায়।

CamScanner

৪.৭ হৃদরোগের বিভিন্ন অবস্থায় করণীয়
(Measures to be taken in different conditions of Heart Disease)

হৃৎপিণ্ড আমাদের দেহের পাম্পযন্ত্র, যা সঞ্চালিত হয়ে সমগ্র দেহে রক্ত প্রেরণ করে। আবার হৃৎপিণ্ডের করোনারি ধমনির মাধ্যমে নিজের কোষ ও পেশির জন্য প্রয়োজনীয় O_2 ও পুষ্টি সরবরাহ করে। সুতরাং হৃৎপিণ্ডের করোনারি ধমনি ও সংশ্লিষ্ট রক্তনালির রোগকে একত্রে **হৃদরোগ** বা **হার্ট ডিজিজ** (heart disease) বা **কার্ডিওভাস্কুলার রোগ** (cardiovascular disease) বা **ইস্কিমিক হার্ট ডিজিজও** (ischaemic heart disease) বলা হয়। বিভিন্ন ধরনের হৃদরোগ আছে এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– **করোনারি হৃদরোগ** (coronary heart disease), **রিউম্যাটিক হৃদরোগ** (rheumatic heart disease: বাতজ্বরজনিত হৃৎপেশি ও কপাটিকার কাজ বন্ধ হওয়ার জন্য রোগ), **উচ্চ রক্তচাপ** (hypertension), **জন্মগত হৃদরোগ** (congenetal heart disease: জন্মগতভাবে হৃৎপিণ্ডের ত্রুটি), **কার্ডিওমেগালি** (cardiomegaly: হৃৎপিণ্ড বড় হয়ে যাওয়া), **কার্ডিওমায়োপ্যাথি** (cardiomyopathy: হৃৎপেশির রোগ) ইত্যাদি। বর্তমান পৃথিবীতে মোট মৃত্যুর 30% হয়ে থাকে হৃদরোগের কারণে। প্রতিবছর বিশ্বে প্রায় 73 লক্ষ লোক এ রোগে মারা যায়। তাই হৃদরোগকে **'বিশ্বের এক নম্বর ঘাতক ব্যাধি'** হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

বুকে ব্যথা বা অ্যানজাইনা (Chest Pain or Angina) বা হৃদশূল

বুকে ব্যথা অনেক ধরনের হয়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো হৃৎপিণ্ডজনিত বুকে ব্যথা। কোনো কারণে করোনারি ধমনির (coronary artery) দ্বারা হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশিতে রক্ত সরবরাহ কমে গেলে বা সরবরাহের তুলনায় চাহিদা বেড়ে গেলে বুকে এক ধরনের ব্যথা অনুভূত হয়। এই ধরনের বুকের ব্যথাকে **অ্যানজাইনা** বা **অ্যানজাইনা পেকটোরিস** (Angina pectoris; Lt. *angere* = কষ্ট + *pectoris* = বুক) বলে। অ্যানজাইনাকে হার্ট অ্যাটাকের পূর্বাবস্থা মনে করা হয়।

অ্যানজাইনার প্রকার: অ্যানজাইনা সাধারণত ৩ ধরনের হয়ে থাকে। যথা-

১। **সুস্থিত অ্যানজাইনা** (Stable angina) : এ ধরনের অ্যানজাইনায় বুকের ব্যথা অনুভূত হয় কেবল পরিশ্রম কিংবা চরম আবেগীয় বিষন্নতার কারণে। বিশ্রামে থাকলে এ ব্যথা চলে যায়।

২। **অস্থিত অ্যানজাইনা** (Unstable angina) : এক্ষেত্রে বিশ্রামের সময় বুকের ব্যথা অনুভূত হয়। এ ব্যথা মাঝে মাঝেই হয়ে থাকে এবং অনেক সময় ব্যাপী প্রচণ্ড ব্যথা অনুভূত হয়। এ ধরনের অ্যানজাইনা হার্ট অ্যাটাকের পূর্ব লক্ষণ।

৩। **প্রিনজমেটাল অ্যানজাইনা** (Prinzmetal angina) : এ ধরনের অ্যানজাইনায় বিশ্রামের সময় কিংবা ঘুমের সময় কিংবা ঠাণ্ডার কারণে দেখা দেয়।

কারণ (Causes)

করোনারি ধমনির ভেতরে উচ্চ মাত্রার কোলেস্টেরল জমে ধমনির অভ্যন্তরে গহ্বর বন্ধ হয়ে যায়। ফলে হৃৎপেশিতে O_2 ও পুষ্টি পদার্থ (গ্লুকোজ) সরবরাহ বন্ধ হয়ে থাকে। কিন্তু হৃৎপেশিগুলোকে দেহে অবিরাম রক্ত সরবরাহের জন্য কার্যক্ষম থাকতে হয়। তখন হৃৎপেশিগুলো বিকল্প পথ ধরে অবাত শ্বসন প্রক্রিয়ায় পাইরুভিক এসিড থেকে শক্তি উৎপন্ন করে। এই সময় উপজাত (biproduct) পদার্থ হিসেবে **ল্যাকটিক এসিড** (lactic acid) উৎপন্ন হয় যা হৃৎপেশিতে জমা হয়। **অধিক ল্যাকটিক এসিড হৃৎপেশিতে জমা হওয়ার কারণে বুকে ব্যথা অনুভূত হয়।**

করোনারি ধমনির সমস্যা ছাড়াও বুকে ব্যথা বা অ্যানজাইনা হতে পারে, যেমন– হৃৎপিণ্ডের কপাটিকাজনিত সমস্যার কারণে অর্থাৎ এ সময় করোনারি ধমনিতে রক্ত প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয়। এছাড়া অ্যানিমিয়ায় আক্রান্ত রোগীরও অ্যানজাইনা দেখা দেয়, কারণ এদের রক্তে পরিমিত O_2 থাকে না। আবার যাদের হৃৎপিণ্ডের প্রাচীর অতিমাত্রায় পুরু তাদের হৃৎপ্রাচীর প্রয়োজনীয় O_2 পায় না। সাধারণত যেকোনো ধরনের পরিশ্রম বা ভারী কাজ করলে বা সিঁড়িতে ওঠানামার মতো পরিশ্রম করলে বুকে ব্যথা অনুভূত হয়। যারা ধূমপায়ী, যাদের বেশি মাত্রায় ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপ আছে, তারাই মূলত অ্যানজাইনায় আক্রান্ত হয়।

অ্যানজাইনার লক্ষণ (Symptoms of Angina)

১। রোগী বুকের ব্যথায় অস্থির হয়ে পড়ে, বিশেষত স্টার্নামের পেছনে চাপ সৃষ্টি হয়।

২। বুক ভারী লাগে। সমগ্র বুক জুড়ে মোচড়ানো ব্যথা অনুভূত হয় এবং একই সঙ্গে ঘাম ঝরতে থাকে।

হৃদরোগজনিত বুকের ব্যথা প্রথম দিকে নির্দিষ্ট করে নির্দেশ করা গেলেও পরবর্তীতে নির্দেশ করা যায় না কারণ অনেক সময় এটি কাঁধ, বাহু, ধড়, চোয়াল বা পিঠে ছড়িয়ে পড়ে।

CamScanner

৩। এই ব্যথা বুকে বাম বা ডান যেকোনো পাশে হতে পারে। ব্যথা ৫-৩০ মিনিট স্থায়ী হয়। বিশ্রাম নিলে ব্যথা আস্তে আস্তে কমে যায়।

৪। বমি বমি ভাব দেখা দেয় অথবা বমি হয়।

৫। পেটে প্রচণ্ড গ্যাস অনুভূত ও জ্বালাপোড়া, চাপ, শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়। অনেক সময় একে বদহজমজনিত ব্যথা বলে ভ্রান্ত ধারণা করা হয়।

৬। ক্লান্তি বোধ হয়, মাথা ঘুরে এবং অনেক সময় রোগী অজ্ঞান হয়ে পড়ে।

৭। ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া কিংবা দম ফুরিয়ে হাঁপানো দেখা দিতে পারে।

৮। মাথা ঝিমঝিম করে বা শরীর ফ্যাকাশে হয়ে যায়।

করণীয়/প্রতিকার (Control)

বুকে ব্যথা হলে দেরি না করে রোগীকে দ্রুত ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত। অনেক সময় হৃদরোগের ব্যথাকে গ্যাস্ট্রিকের ব্যথা মনে করে ডাক্তারের কাছে যেতে দেরি করেন, যা মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বুকে ব্যথা হলে অবশ্যই কার্ডিওলজিস্টের কাছে যেতে হবে এবং **ECG ও ইকোকার্ডিওগ্রামের মাধ্যমে ব্যথার কারণ শনাক্ত করতে হবে।** উপযুক্ত চিকিৎসা (অপারেশন বা এনজিওগ্রাম) এবং সমস্যার প্রতি যথাযথ মনোযোগ দিলে অ্যানজাইনা নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। **বিশ্রাম নিলে বা জিহ্বার নিচে গ্লিসারাইল ট্রাইনাইট্রেট** (glyceryl trinitrate -GTN) স্প্রে করলে বা ওষুধ খেলে ব্যথা কমে। এই ধরনের ওষুধের ফলে করোনারি ধমনির প্রসারণ ঘটে এবং রক্তপ্রবাহ স্বাভাবিক হয়। এছাড়া ধূমপান বর্জন করা উচিত। প্রতিদিন হালকা ব্যায়াম করা, শরীরের ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা, চর্বিযুক্ত খাবার পরিহার করা, ধূমপান ও মদ্যপান ত্যাগ করা, উচ্চ রক্তচাপ এবং ডায়াবেটিস রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখলে অ্যানজাইনার সম্ভাবনা কমে যায়। প্রয়োজনে সম্পূর্ণ শরীর বছরে একবার বা দু'বার চেকআপ করিয়ে নেওয়া।

হার্ট অ্যাটাক (Heart Attack or Myocardial Infraction)

করোনারি ধমনিতে কোলেস্টেরল জমে ব্লকেজের পরিমাণ বেড়ে শতভাগ হয়ে যায় এবং ধমনিপথে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে আসে তখন পর্যাপ্ত O_2 সমৃদ্ধ রক্ত সরবরাহের অভাবে কার্ডিয়াক পেশিগুলো অকার্যকর হয়ে কিংবা মরে গিয়ে যে সমস্যা সৃষ্টি করে তাকেই সাধারণ ভাষায় **হার্ট অ্যাটাক** (heart attack) বলে। হার্ট অ্যাটাকের অপর নাম **মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্রাকশন** বা **এম আই** (myocardial infraction-MI)। **Myocardial অর্থ—হৃৎপেশি ও infraction অর্থ—O_2 এর অভাবে শ্বাসবন্ধ হয়ে যাওয়া।** প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য, মস্তিষ্কের রক্তনালিতে রক্ত সরবরাহ বন্ধ হলে তাকে **স্ট্রোক** (stroke) বলা হয়। স্ট্রোককে কখনো কখনো **সেরিব্রোভাস্কুলার দুর্ঘটনা** (cerebro-vascular accidents) বলা হয়।

কারণ (Causes)

হার্ট অ্যাটাকের প্রধান কারণগুলো হলো ধূমপান, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, করোনারি ধমনিতে স্নেহ জাতীয় পদার্থের (কোলেস্টেরল) আধিক্য ও পজেটিভ ফেমিলি হিস্ট্রি। মূলত করোনারি ধমনিতে কোলেস্টেরল সঞ্চিত হওয়ার ফলে ধমনির গহ্বর ছোট হয়ে বা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে অপর্যাপ্ত রক্তপ্রবাহের ফলে এ রোগের সৃষ্টি হয়। এছাড়াও রক্তের অনুচক্রিকার কার্যকারিতা বেড়ে গেলে এবং রক্তের ফাইব্রিনোজেন ও ফ্যাক্টর VIII বেড়ে গেলে হার্ট অ্যাটাক হতে পারে। হার্ট অ্যাটাক কখন ঘটবে তা কেউ জানে না।

হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ (Symptoms of Heart Attack)

১। হার্ট অ্যাটাকের প্রাথমিক লক্ষণ হলো বুকে তীব্র ও অসহনীয় ব্যথা অনুভূত হওয়া। **এছাড়া প্রচুর ঘাম বা শীতল ঘাম হওয়া হার্ট অ্যাটাকের একটি সাধারণ লক্ষণ।**

২। স্টার্নামের পেছনে হঠাৎ তীব্র ব্যথা; এই ব্যথা কখনো কখনো বুক, গলা, ঘাড়, ওপরের পেট, দুই হাত এবং পিঠেও চলে যেতে পারে। তবে সব সময় বুকে ব্যথা নাও হতে পারে। পুরুষের হার্ট অ্যাটাকের ব্যথা অনেকসময় বাম বাহুতে এবং নারীদের দু'বাহুতে হতে পারে।

৩। শ্বাসকষ্ট (shortness of breath), বমি বমি ভাব (nausea) বা বমি (vomiting) হতে পারে, বুক ধড়ফড়ানি (palpitations), বদহজম ও মাথা ঝিমঝিম করা।

৪। দ্রুত বা অনিয়মিত হৃৎস্পন্দন, ঘুমে ব্যাঘাত এবং সেই সঙ্গে দুর্বলতা ও শ্বাসকষ্ট।

CamScanner

৫। সংজ্ঞাহীন হওয়া (loss of consciousness) বা হঠাৎ মৃত্যু ঘটা (sudden death)। শেষ রাতে ও সকাল ৮-৯টার পূর্ব পর্যন্ত হার্ট অ্যাটাকের হার সবচেয়ে বেশি। তাই শেষ রাতে বা ভোরে বুকের ব্যথাকে অবহেলা করা ঠিক নয়।

৬। অনেক সময় অবিরাম কাশি বা বুকে শোঁ শোঁ শব্দ হতে পারে।

৭। হার্ট অ্যাটাকের কয়েকদিনের মধ্যে পায়ে, গোড়ালিতে, পায়ের পাতা বা উদরে পানি জমা হতে পারে।

৮। হার্ট অ্যাটাকের সময় কিংবা অ্যাটাকের কয়েকদিন পূর্ব হতে শরীর অস্বাভাবিক দুর্বল অনুভূত হবে।

করণীয়/প্রতিকার (Control)

হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। যত দেরি হবে তত বেশি হৃৎপেশি নষ্ট হতে থাকবে এবং রোগীর মৃত্যুর সম্ভাবনা বেড়ে যাবে। সন্নিকটে হৃদরোগের চিকিৎসা সুবিধা সংবলিত হাসপাতাল থাকলে সেখানে নিয়ে যাওয়া উত্তম। এসব রোগীর জন্য কার্ডিয়াক হাসপাতালে **করোনারি কেয়ার ইউনিট** বা **ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট** (coronary care unit-CCU or intensive care unit-ICU) থাকে। ফলে রোগী দ্রুত চিকিৎসার আওতায় চলে আসে। হাসপাতালে নেওয়ার মাঝামাঝি সময়ে করণীয় বিষয়গুলো হলো–

(i) জিহ্বার নিচে **নাইট্রোগ্লিসারিন স্প্রে** দুই চাপ দিতে হবে বা ১টি **গ্লিসারাইল ট্রাইনাইট্রেট** ট্যাবলেট দিতে হবে।

(ii) এছাড়া ৭৫ মি. গ্রাম ৪টি অ্যাসপিরিন ট্যাবলেট গুলিয়ে রোগীকে খাওয়াতে হবে।

(iii) আধাশোয়া অবস্থায় হাসপাতালে নিতে হবে এবং দ্রুত কার্ডিওলজিস্টের তত্ত্বাবধানে আনতে হবে।

কার্ডিওলজিস্টের নির্দেশমতো হার্ট অ্যাটাক নির্ণয়ের জন্য বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা, যেমন– ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম (electrocardiogram-ECG), ইকোকার্ডিওগ্রাম (echocardiogram), MRI, করোনারি এনজিওগ্রাম (coronary angiogram), চেস্ট রেডিওগ্রাফ (chest radiograph) ইত্যাদি করতে হবে। অতঃপর রোগ শনাক্ত হলে চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে এনজিওপ্লাস্টি অথবা করোনারি বাইপাস করতে হবে।

হার্ট ফেইলিউর (Heart failure)

হৃৎপিণ্ডের অ্যাট্রিয়াম ও ভেন্ট্রিকল বা উভয়ের সংকোচন ক্ষমতা লোপ পাওয়াকে **হার্ট ফেইলিউর** বলে। হার্ট ফেইলিউরের ফলে হৃৎপিণ্ড শরীরের চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত রক্ত সঞ্চালন করতে পারে না। হার্ট ফেইলিউর হৃৎপিণ্ডের বামপাশে বা ডানপাশে হতে পারে।

কারণ (Causes)

হৃৎপিণ্ডের করোনারি ধমনির অন্তঃস্থ গাত্র কোলেস্টেরলের কারণে সরু হলে পর্যাপ্ত O_2 এর অভাবে হার্ট ফেইলিউর ঘটে। এছাড়াও উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিসের কারণে হার্ট ফেইলিউর হতে পারে। দেহে ইনসুলিন উৎপাদন বা সঠিক ব্যবহার ব্যাহত হলে হৃৎপেশি ও হৃৎপিণ্ডের কণিকাগুলো দুর্বল হয়ে পড়ে, ফলে হার্ট ফেইলিউর ঘটে। হৃৎপিণ্ডের জন্মগত বা সংক্রমণজনিত রোগের কারণেও হার্ট ফেইলিউর ঘটে। এমনকি হৃৎপিণ্ডের ভাল্ব বা কপাটিকাজনিত সমস্যা, হৃৎপিণ্ডের ছন্দোপতন, এম্ফাইসেমা, থাইরয়েড গ্রন্থির অতিসক্রিয়তা, প্রবল রক্তস্বল্পতা বা অ্যানিমিয়া, স্থূলতা, অতিরিক্ত ধূমপান ও মদ্যপান, ইস্কিমিক হার্ট ডিজিজ এবং বুকের সংক্রমণেও হার্ট ফেইলিউর হয়।

হার্ট ফেইলিউর-এর লক্ষণ (Symptoms of Heart failure)

হৃৎপিণ্ডের বাম পাশে হার্ট ফেইলিউর হলে : (১) শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি ও সময় কমে যায়। (২) যেকোনো কায়িক পরিশ্রমে শ্বাসকষ্ট হয়। (৩) শুষ্ক কফের সৃষ্টি হয় যা বের করা যায় না। (৪) হৃৎপেশি দুর্বল হয়ে পড়ে। (৫) ক্লান্ত ও অবসাদগ্রস্ত অনুভূত হয়। (৬) রোগীর ওজন কমে যায়।

ডান পাশে হার্ট ফেইলিউর হলে : (১) হাত-পা ফুলে যায় (ওডেমা)। (২) পা এর নিচের অংশের ত্বক শুষ্ক হয়ে যায়। (৩) পায়ে লাল দাগ পড়ে যা পরবর্তীতে ঘায়ে পরিণত হয়। (৪) রাত্রে প্রস্রাবের বেগ বেড়ে যায়। (৫) ফুসফুস ও যকৃতে পানি জমে ফুলে যায়। (৬) উদরীয় অঞ্চলে ব্যথা অনুভব হয়।

করণীয়/প্রতিকার (Control)

হার্ট ফেইলিউরের লক্ষণ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে হৃদরোগ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে। ডাক্তারের নির্দেশমতো ওষুধ সেবন করতে হবে। এই ধরনের রোগীদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন শারীরিক ও মানসিক বিশ্রাম। প্রচুর বিশ্রাম নিতে হবে। খাবারে আলগা লবণ বর্জন করতে হবে। রক্তের কোলেস্টেরল মাত্রা সহনীয় পর্যায়ে রাখতে হবে। BMI মেনে চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী চলতে হবে। শরীরে ধমনি ও শিরাকে প্রসারিত রাখে এমন ওষুধ সেবন করতে হবে। সর্বোপরি হার্ট ফেইলিউর রোগীদের সবসময় চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী চলতে হবে। প্রয়োজনে চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী শল্যচিকিৎসা (যেমন– এনজিওপ্লাস্টি অথবা করোনারি বাইপাস ইত্যাদি) করতে হবে।

CamScanner

করোনারি হৃদরোগের ঝুঁকি সৃষ্টিকারী উপাদানসমূহ (Risk Factors of Coronary Heart Disease) : ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, করোনারি ধমনিতে স্নেহ জাতীয় পদার্থের (কোলেস্টেরল) আধিক্য অর্থাৎ অ্যার্টারিওস্ক্লেরোসিস (arteriosclerosis) হওয়া, পজেটিভ ফেমিলি হিস্ট্রি, বয়স, লিঙ্গ, ধূমপান, স্থূলতা, শারীরিক নিষ্ক্রিয়তা ও বিকিরণ চিকিৎসা প্রভৃতি।

হৃদরোগ প্রতিরোধে করণীয় (Measures to Prevent Coronary Heart Disease)

- আদর্শ জীবনযাপন করা।
- ধূমপান বর্জন করা।
- অ্যালকোহল বা মদ্যপান পরিত্যাগ করা।
- প্রতিদিন হালকা ব্যায়াম করা এবং নিয়মিত কায়িক শ্রমে নিযুক্ত থাকা অর্থাৎ দেহের ওজন (BMI-Body Mass Index) স্বাভাবিক রাখা। নির্দিষ্ট খাদ্য তালিকা অনুযায়ী খাদ্য গ্রহণ করা।
- বেশি শাকসবজি ও সালাদ খাওয়া এবং গিলা, কলিজা, মগজ ও গরু-মহিষের লাল মাংস বর্জন করা।
- তেল, চর্বি, মিষ্টি কম খাওয়া।
- আলগা লবণ বর্জন করা অর্থাৎ খাদ্যে লবণের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা।
- উচ্চ রক্তচাপ, স্ট্রোক, ডায়াবেটিস বা কিডনির সমস্যা থাকলে চিকিৎসা গ্রহণ করা এবং চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী যথাযথ ওষুধ ধারাবাহিকভাবে সেবন করা।
- উত্তেজনা প্রশমন করা। দুশ্চিন্তামুক্ত প্রফুল্ল-আনন্দময় জীবনযাপন করা ইত্যাদি।
- বছরে অন্তত একবার অথবা সম্ভব হলে দু'বার সমগ্রদেহ চেকআপের ব্যবস্থা করা।

সর্বোপরি, হৃদরোগ প্রতিরোধের জন্য নিজে সচেতন থাকা এবং অপরকে সচেতন হতে উদ্বুদ্ধ করা।

❑ **কাজ :** (i) অ্যানজাইনা রোগ হলে কী ধরনের জটিলতা দেখা দিতে পারে? (ii) অ্যানজাইনা রোগের প্রতিরোধ সম্পর্কে তোমার মতামত দাও।/অ্যানজাইনা থেকে নিরাময়ে তোমার মতামত দাও। (iii) হার্ট ফেইলিউরের লক্ষণগুলো সম্পর্কে লেখ। (iv) উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত মানুষের দেহে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি থাকলেও রক্তশূন্যতা সৃষ্টির সম্ভাবনা নেই– বিশ্লেষণ কর। (v) বুকে ব্যথা যে সকল রোগের কারণে হতে পারে তা প্রতিরোধে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়– যুক্তিসহ ব্যাখ্যা কর।

৪.৮ হৃদরোগের চিকিৎসার ধারণা
(The Concept of the Treatment of Heart Disease)

হৃদরোগের চিকিৎসা যেমন হৃদরোগের মৃত্যুর সম্ভাবনা কমায়, ঠিক তেমনি রোগীকে শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে সুস্থ জীবনযাপনে সাহায্য করে। কাজেই হৃদরোগের চিকিৎসা সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। কিছু শারীরিক উপসর্গ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে করোনারি হৃদরোগ সহজেই নির্ণয় করা যায়, যা পরবর্তী সময় চিকিৎসার ধরন ঠিক করতে সাহায্য করে।

সহজলভ্য এবং তুলনামূলক স্বল্প ব্যয়ের পরীক্ষার মধ্যে রয়েছে :

- চিকিৎসকগণ হার্টবিটের বৃদ্ধি, হৃৎপিন্ডের অস্বাভাবিক শব্দ, পা ফুলে যাওয়া, ঘাড়ের শিরা ফুলে যাওয়া, যকৃৎ বড় হওয়া ইত্যাদি লক্ষণগুলো দেখে হৃৎরোগ সহজেই নির্ণয় করতে পারেন।
- বুকের X-ray করানোর মাধ্যমে হৃৎপিন্ডের অবস্থা জানা যায়।
- ইসিজি (ECG-Electrocardiogram): করোনারি হৃদরোগ নির্ণয়ের প্রাথমিক পরীক্ষা।
- কার্ডিয়াক এনজাইমস (Cardiac Enzymes) : যেমন– ট্রপোনিন, সিকে-এমবি (CK-MB- Creatine Kinase, Muscle and Brain): এদের পরিমাণ বা মাত্রা দ্বারা নির্ণয় করা হয় রোগীর হার্ট অ্যাটাক হয়েছে কিনা।
- ইটিটি (ETT-Exercise Tolerance Test): হার্টের অবস্থা বা কর্মক্ষমতা বোঝার জন্য।
- ইকোকার্ডিওগ্রাম (Ecocardiogram): হার্টের অবস্থা বা কর্মক্ষমতা বোঝার জন্য।
- রক্তের BNP (Brain Natriuretic Peptide) পরীক্ষার মাধ্যমে হার্ট ফেইলিউর সম্পর্কে জানা।
- হৃৎপিণ্ডের পেশির অবস্থা জানার জন্য MRI (Magnetic Resonance Imaging) পরীক্ষা করা।
- উচ্চ রক্তচাপ আছে কিনা তা পরীক্ষা করা।
- রক্তে শর্করা ও চর্বির পরিমাণ পরীক্ষা করা।

CamScanner

ঝুঁকিপূর্ণ ও ব্যয়বহুল পরীক্ষার মধ্যে রয়েছে :

(ক) করোনারি এনজিওগ্রাম (Coronary angiogram) : (i) প্রচলিত পদ্ধতিতে এনজিওগ্রাম ও (ii) সিটি এনজিওগ্রাম।

(খ) থেলিয়াম আপটেক টেস্ট বা মায়োকার্ডিয়াল পারফিউশন ইমাজিং (Thallium uptake test or myocardial perfusion imaging -MPI)।

ইসিজি (ECG-Electrocardiogram) : রোগী বুকে ব্যথা নিয়ে চিকিৎসকের কাছে গেলে চিকিৎসক যদি মনে করেন এটি হৃদরোগজনিত ব্যথা হতে পারে, তবে সর্বপ্রথম তিনি রোগীকে একটি ইসিজি করার পরামর্শ দেন। ইসিজি হলো করোনারি হৃদরোগ নির্ণয়ের প্রাথমিক পরীক্ষা। ইসিজিতে কিছু বৈশিষ্ট্যমূলক পরিবর্তন দেখে শনাক্ত করা যায় যে, রোগী করোনারি হৃদরোগে ভুগছেন কিনা অথবা তার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে কিনা।

কার্ডিয়াক এনজাইমস (Cardiac Enzymes) : রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে কার্ডিয়াক এনজাইমস, যেমন– **ট্রপোনিন, সিকে-এমবি** ইত্যাদির পরিমাণ বা মাত্রা দ্বারা নির্ণয় করা হয় রোগীর হার্ট অ্যাটাক হয়েছে কিনা।

ইটিটি ও ইকোকার্ডিওগ্রাম (ETT-Exercise Tolerance Test and Ecocardiogram) : আবার কিছু রোগী আছেন, যারা বিশ্রামের সময়, সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় বা জোরে হাঁটেন তখন বুকে ব্যথা অনুভব করেন। তাদের ক্ষেত্রে করা হয় **ইটিটি** আর হার্টের কর্মক্ষমতা বোঝার জন্য করা হয় **ইকোকার্ডিওগ্রাম**।

করোনারি এনজিওগ্রাম (Coronary Angiogram) : করোনারি এনজিওগ্রামের মাধ্যমে করোনারি ধমনিতে **ব্লকেজের** পরিমাণ কতটুকু তা নির্ণয় করা হয়। এক্ষেত্রে রোগীর হাত বা উরুর শিরাপথে ইনজেকশনের মাধ্যমে **তরল রঞ্জক পদার্থ** (dye) প্রবেশ করানো হয় এবং উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন গামা ক্যামেরার মাধ্যমে তা পর্যবেক্ষণ করা হয়।

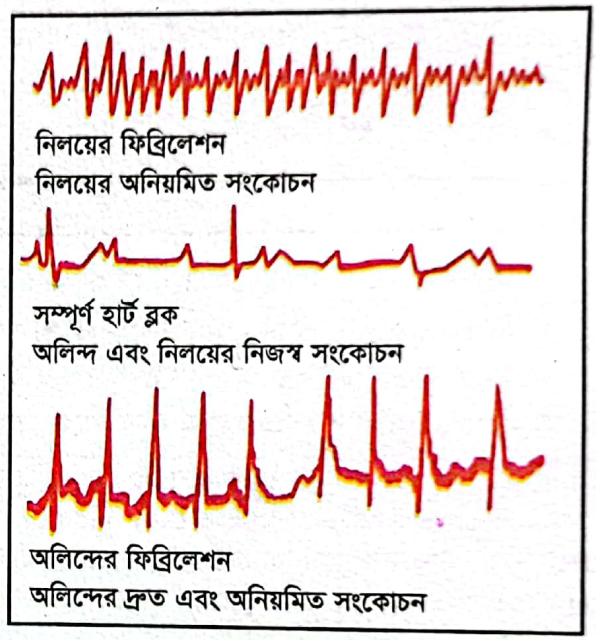

চিত্র ৪.১৪ : হৃৎপিণ্ডের অস্বাভাবিক অবস্থায় ধারণকৃত ইসিজি

হৃদরোগের প্রচলিত চিকিৎসা

প্রচলিত চিকিৎসাব্যবস্থায় হৃদরোগীদের যেসব ওষুধ সেবন করার পরামর্শ দেওয়া হয় তাদের তিন ধরনের ওষুধ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যথা– **প্রথমত,** ব্যথা কমানোর ওষুধ। হৃদরোগীদের পকেটে বা ব্যাগে সবসময় একটি স্প্রে-জাতীয় ওষুধ (**নাইট্রোগ্লিসারিন,** Nitroglycerin) রাখতে দেওয়া হয়। বুকে ব্যথা বা চাপ অনুভূত হলে এটি ব্যবহার করে থাকেন। **দ্বিতীয়ত,** রক্ত জমাটবদ্ধতা রোধের জন্য **অ্যান্টিপ্লেটলেট** ওষুধ। যেমন : **অ্যাসপিরিন, ক্লোপিডগ্রেল** ইত্যাদি। **তৃতীয়ত,** রক্তে কোলেস্টেরল মাত্রা কমানোর ওষুধ। যেমন : **স্ট্যাটিন, ফাইব্রেট** ইত্যাদি। আবার ব্লকেজের পরিমাণ বেশি হলে প্রয়োজন হয় **ইন্টারভেনশন** ও **সার্জিক্যাল** চিকিৎসার। ইন্টারভেনশন হলো **এনজিওপ্লাস্টি** (বেলুনিং ও স্টেন্টিং বা ধাতব রিং পরানো) আর সার্জিক্যাল চিকিৎসা হচ্ছে **বাইপাস অপারেশন**।

পেসমেকার (Pacemaker)

মানুষের হৃৎপিণ্ডের ডান অ্যাট্রিয়ামের প্রাচীরে অবস্থিত SAN বা **সাইনোঅ্যাট্রিয়াল নোড** (Sino-Atrial Node) প্রাকৃতিক পেসমেকার হিসেবে কাজ করে যাকে **প্রাথমিক পেসমেকার** (Primary Pacemaker) বলে। SAN হলো হৃৎপিণ্ডের বিশেষ সংযোগী কলা (specialized junctional tissue)। SAN ডান অলিন্দের **ঊর্ধ্ব মহাশিরা** (superior venacava) এবং অলিন্দ উপাঙ্গের (atrial appendage) সংযোগস্থলে এপিকার্ডিয়াম এবং এন্ডোকার্ডিয়ামের মধ্যে অবস্থিত।

SAN-এর ঊর্ধ্ব প্রান্ত প্রশস্ত এবং প্রান্তদেশ সুচালো। এটি সূক্ষ্ম লম্বাটে দুই মুখ সুচালো রূপান্তরিত **পেশিকোষের** সমন্বয়ে গঠিত। এদের ব্যাস স্বাভাবিক হৃৎপেশির এক-তৃতীয়াংশ। এরূপ পেশিকোষে নিউক্লিয়াস কেন্দ্রস্থলে অবস্থান করে এবং এরা অস্পষ্ট অনুদৈর্ঘ্য ডোরাসম্পন্ন। পেশিকোষগুলো পরস্পর তন্তুজাল গঠন করে। এদের সারকোপ্লাজমের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বেশি এবং মায়োফাইব্রিলের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম। এছাড়া SAN-এ পারকিনজি

CamScanner

তন্তুর ঘন তন্তুজাল থাকে। স্পন্দনপ্রবাহ প্রথম SAN-এ উৎপন্ন হয় এবং হৃৎপিণ্ডের অন্যান্য সংযোগী কলার দ্বারা অলিন্দ ও নিলয় পেশিতে পরিবাহিত হয়ে হৃৎপিণ্ডের সংকোচন-প্রসারণের ছন্দকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাই SAN-কে **ছন্দনিয়ামক বা প্রাকৃতিক পেসমেকারও** বলা হয়। হৃৎপেশিকোষ অন্যান্য কোষের মতো বাইরের দিকে **ধনাত্মক চার্জবিশিষ্ট** এবং ভেতরের দিকে **ঋণাত্মক চার্জ** থাকে। পেসমেকারে এই আধান বা চার্জ *স্বতঃস্ফূর্তভাবে* মিনিটে প্রায় ৭০-৮০ বার পরিবর্তিত হয়। এটি আবার সংলগ্ন পেশিকোষে আধান পরিবর্তনের সূচনা করে এবং এভাবে একটি সূক্ষ্ম প্রবাহ অলিন্দের সমস্ত অংশে ছড়িয়ে পড়ে এবং এর ফলে অলিন্দ সংকুচিত হয়। এই উদ্দীপনা সরাসরি নিলয়ে সঞ্চালিত হতে পারে না। কারণ অলিন্দ পেশি ও নিলয় পেশির মাঝে স্নেহ বস্তুর একটি পাতলা স্তর থাকে।

কৃত্রিম বা যান্ত্রিক পেসমেকার (Artificial Pacemaker)

কৃত্রিম পেসমেকার একটি লিথিয়াম ব্যাটারি, কম্পিউটারাইজড **জেনারেটর** ও শীর্ষে **সেন্সরযুক্ত** কতকগুলো তার বা **লিড** (lead) নিয়ে গঠিত। সেন্সরগুলোকে **ইলেকট্রোড** (electrode) বা **ক্যাথোড** বলে। ব্যাটারি জেনারেটরকে শক্তি সরবরাহ করে। এ দুটি জিনিস একটি পাতলা ধাতব বাক্সে আবৃত থাকে। তারগুলোর সাহায্যে জেনারেটরকে হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। ইলেকট্রোডগুলো হৃৎপিণ্ডের বৈদ্যুতিক কর্মকাণ্ড শনাক্ত করে তারের মাধ্যমে জেনারেটরে প্রেরণ করে। পেসমেকারে অপরিবাহী আবরণযুক্ত (insulated) ১-৩টি তার থাকে। ইহার ওজন প্রায় ৩০-১৩০ গ্রাম। **কৃত্রিম পেসমেকারের মাধ্যমে মানুষের অনিয়ন্ত্রিত হৃৎস্পন্দন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়।** কৃত্রিম পেসমেকারের আয়ুষ্কাল প্রায় ৫-১০ বছর পর্যন্ত হতে পারে।

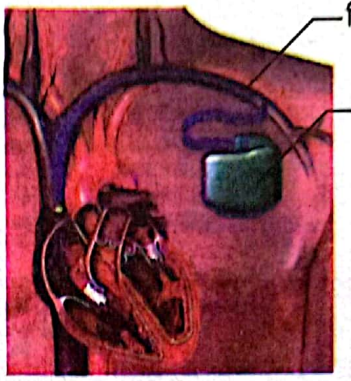

চিত্র ৪.১৫ : হৃৎপিণ্ডের অভ্যন্তরে কৃত্রিম পেসমেকার

আমেরিকান বিজ্ঞানী **William Chardack** এবং **Wilson Greatbatch** (1969) দেহে স্থাপনযোগ্য পেসমেকার আবিষ্কার করেন। পেসমেকার স্থায়ী বা অস্থায়ী হতে পারে। বর্তমানে হৃদরোগের চিকিৎসায় পেসমেকার ছাড়াও **আইসিডি** (ICD- implantable cardioverter defibrillator) নামক আধুনিক যন্ত্র ব্যবহার করা হয়।

হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে তার প্রবেশের ধরন অনুযায়ী পেসমেকার সাধারণত তিন ধরনের হয়ে থাকে। যথা– এক-প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট পেসমেকার, দ্বি-প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট পেসমেকার এবং ত্রি-প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট পেসমেকার।

১। এক-প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট পেসমেকার : এ ধরনের পেসমেকারে একটি তার দ্বারা জেনারেটর থেকে হৃৎপিণ্ডের শুধু ডান অ্যাট্রিয়াম (অলিন্দ) বা ডান ভেন্ট্রিকলে (নিলয়) বিদ্যুৎ তরঙ্গ বহন করে।

২। দ্বি-প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট পেসমেকার : এ ধরনের পেসমেকারে দুটি তার দ্বারা জেনারেটর থেকে হৃৎপিণ্ডের দুটি প্রকোষ্ঠে অর্থাৎ ডান অ্যাট্রিয়াম ও ডান ভেট্রিকলে বিদ্যুৎ তরঙ্গ বহন করে।

৩। ত্রি-প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট পেসমেকার : এ ধরনের পেসমেকারে তিনটি তার দ্বারা একটি জেনারেটর থেকে যথাক্রমে ডান অ্যাট্রিয়াম, ডান ভেন্ট্রিকল এবং বাম ভেন্ট্রিকলে বিদ্যুৎ তরঙ্গ বহন করে। এটি অত্যন্ত দুর্বল প্রকৃতির হৃৎপিণ্ডের ক্ষেত্রে স্থাপন করা হয়। এক্ষেত্রে পেসমেকার ভেন্ট্রিকলদ্বয়ের সংকোচন ক্ষমতার উন্নতি ঘটিয়ে রক্তপ্রবাহে উন্নতি ঘটায়। পেসমেকার মানুষের অনিয়ন্ত্রিত হৃৎস্পন্দন নিয়ন্ত্রণে আনে। এ যন্ত্র হতে নিম্ন মাত্রার বৈদ্যুতিক সংকেত সৃষ্টি হয়ে হৃৎস্পন্দনের সূচনা করে।

কৃত্রিম পেসমেকারের কার্যক্রম (Artificial Pacemaker Activities) **:** SAN অর্থাৎ প্রাকৃতিক পেসমেকার বিকল হলে একটি স্পন্দন প্রবাহ উৎপন্ন করতে ব্যর্থ হয়, তখন হৃৎস্পন্দন (heart beat) অনিয়মিত হয়। এ অবস্থাকে বলা হয় **অ্যারিথমিয়া** (arrhythmia)। এসময় হার্ট বিট খুব দ্রুত (tachycardia) গতিতে বা খুব মন্থর (bradycardia) গতিতে সংঘটিত হয়। ফলে হৃৎপিণ্ড পর্যাপ্ত রক্ত দেহে সরবরাহ করতে পারে না। কৃত্রিম পেসমেকার দ্বারা অ্যারিথমিয়া সংশোধন করা হয়।

কৃত্রিম পেসমেকার হৃৎপিণ্ডকে নিয়মিত ব্যবধানে উদ্দীপিত করে এবং ফলে হৃৎপিণ্ড তার **ছন্দময়তা** (rhythmicity) ফিরে পায়। একটি পেসমেকার প্রয়োজনের অত্যন্ত সাধারণ মেডিকেল অবস্থাকে বলা হয় **ব্রাডিকার্ডিয়া** (bradycardia) অর্থাৎ এটা হৃৎপিণ্ডের হার যা দেহের চাহিদা মেটাতে অপ্রতুল। ব্রাডিকার্ডিয়াতে ভুগলে, হৃৎস্পন্দন প্রতি মিনিটে ৬০ এর নিচে থাকবে এবং দেহের অঙ্গাদিতে রক্তের সরবরাহ বিশেষত মস্তিষ্কে অপর্যাপ্ত রক্ত সরবরাহ হবে।

CamScanner

ফলস্বরূপ, সম্ভবত ব্রাডিকার্ডিয়ার উপসর্গের অভিজ্ঞতা পাবে, যেমন– ঝিমুনি ভাব, চূড়ান্ত অবসাদ, শ্বাসকষ্ট, ব্যায়ামে অবসন্নতা, মূর্ছা যাওয়া। যখনই রোগীর হৃৎস্পন্দন অত্যন্ত ধীরে হবে, তখনই কৃত্রিম পেসমেকার এটাকে উদ্দীপিত করে নির্দিষ্ট হারে হৃৎস্পন্দন ঘটাবে। এইসব বৈদ্যুতিক নাড়ির স্পন্দনের কারণে হৃৎপিণ্ড সংকুচিত হয় এবং হৃৎপিণ্ডের কম-বেশি স্বাভাবিক হার ফিরে আসে, যা ব্রাডিকার্ডিয়ার উপসর্গগুলো কমায় বা দূর করে।

কৃত্রিম পেসমেকার স্থাপন কৌশল : রোগের মাত্রা অনুসারে রোগীর দেহে অস্থায়ী বা স্থায়ী পেসমেকার স্থাপন করা হয়। সাধারণত স্বল্প মেয়াদি হৃৎপিণ্ডের সমস্যা (যেমন– হার্ট অ্যাটাক ঘটাতে পারে এমন ধীর হার্টবিট বা হৃৎস্পন্দন) কিংবা হার্ট সার্জারির সময় জরুরি ভিত্তিতে অস্থায়ী পেসমেকার ব্যবহার করা হয়। আর দীর্ঘমেয়াদি হৃৎপিণ্ডের অ্যারিথমিয়ার সমস্যার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় স্থায়ী পেসমেকার।

(ক) অস্থায়ী পেসমেকার স্থাপন কৌশল : এ ধরনের পেসমেকার স্থাপনের ক্ষেত্রে জেনারেটরটিকে শরীরের বাইরে রেখেই লিডটিকে শিরার ভেতরে ঢুকিয়ে হৃৎপিণ্ডে পৌঁছানো হয়। জেনারেটরটি বৈদ্যুতিক সংকেত সৃষ্টি করে এবং এ সংকেত লিডের সাহায্যে পরিমিত মাত্রায় হৃৎপিণ্ডে পৌঁছায়। এতে প্রয়োজনীয় হারে হৃৎস্পন্দন সৃষ্টি হয় এবং হৃৎপিণ্ডের কার্যক্রম স্বাভাবিক হয়। এটি সর্বোচ্চ একমাস পর্যন্ত রাখা যেতে পারে।

(খ) স্থায়ী পেসমেকার স্থাপন কৌশল : যদি রোগীর দীর্ঘকালীন সময়ের জন্য পেসমেকারের প্রয়োজন হয় তবে সেক্ষেত্রে এ ধরনের পেসমেকার সংস্থাপন করা হয়। এক্ষেত্রে দ্বি-প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট পেসমেকার ব্যবহার করাই শ্রেয়। কৃত্রিম পেসমেকার রোগীর বুকে শল্যচিকিৎসার দ্বারা বসিয়ে দেওয়া হয়। স্থায়ী পেসমেকার স্থাপনের শুরুতে রোগীকে স্থানীয় অ্যানেসথেসিয়া দিয়ে সংশ্লিষ্ট অঞ্চল সংবেদনহীন (অবশ) করা হয়। এরপর কণ্ঠাস্থির বা ক্ল্যাভিকলের (clavicle) নিচে ত্বকের একটি অংশ কেটে একটি পকেট তৈরি করা হয়। এটি সাধারণত বাম দিক বরাবর করা হয়ে থাকে। এ পকেটটির মধ্যে পেসমেকার বসানো হয়। ক্ল্যাভিকলের পেছনে একটি ছিদ্র করে সেন্সরযুক্ত লিড বা তারের ক্যাথোড প্রান্তটি উপযুক্ত শিরার ভেতর দিয়ে হৃৎপিণ্ডের উপযুক্ত স্থানে সংযুক্ত করা হয় অর্থাৎ একটি লিডের মুক্ত প্রান্ত বাম অ্যাট্রিয়ামে ও অন্যটির মুক্ত প্রান্ত ডান ভেন্ট্রিকলে সংযুক্ত করা হয়। পেসমেকারের জেনারেটর দ্বারা উৎপাদিত বৈদ্যুতিক সংকেত গ্রহণযোগ্য মাত্রাতে হৃৎপিণ্ডে পৌঁছে এবং প্রয়োজনীয় স্পন্দন শুরু হয়। ফলে হৃৎপিণ্ডের মন্থর স্পন্দন গতিশীল হয় এবং দ্রুত হারের স্পন্দন কমে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। এরূপ সম্পূর্ণ পদ্ধতিটি তৈরিকৃত পকেটটির মধ্যেই সম্পন্ন করা হয়। পকেট তৈরির জন্য কাটা অংশটি শোষণ উপযোগী সূচার দিয়ে বন্ধ করা হয়।

একটি পেসমেকার স্থাপন করতে ৩০ মিনিট থেকে ১ ঘণ্টার মতো সময় লাগে। পেসমেকার স্থাপন করার পর রোগীকে হাসপাতাল থেকে ১-৩ দিনের মধ্যে বিদায় দেওয়া হয়। পেসমেকার সাধারণত ঝুঁকিপূর্ণ নয়। তবে এতে স্বল্প মাত্রায় রক্তক্ষরণ, ফুসফুসের হালকা ছিদ্র, এমনকি হৃৎপিণ্ডেও হালকা ছিদ্র হতে পারে। পেসমেকার যন্ত্রটি বেশিদিন স্থায়ী হলেও লিথিয়াম ব্যাটারির আয়ুষ্কাল (প্রায় ৫-১০ বছর) কম হওয়ার কারণে এটি প্রয়োজনে পরিবর্তন করতে হয়।

সাবধানতা

কৃত্রিম পেসমেকার স্থাপনকারী রোগীদের কিছু সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। যেমন- চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ব্যায়াম, খেলাধুলা এমনকি দৈহিক পরিশ্রম না করা এবং নিয়মিত হৃৎস্পন্দন পর্যবেক্ষণ করা। উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখা। সেলুলার ফোন নিকটবর্তী স্থানে না রাখা। ইলেকট্রিক ওভেন ও ইলেকট্রিক জেনারেটর ব্যবহারে সতর্ক থাকা। পেসমেকার বসানোর স্থানে চাপ না দেওয়া। X-Ray বা MRI করার সময় সর্তক থাকা। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী নিয়মিত ওষুধ সেবন এবং যেকোনো শারীরিক সমস্যা মনে হলে সাথে সাথে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

ওপেন হার্ট সার্জারি (Open Heart Surgery)

চিকিৎসকরা যখন বক্ষের অস্থিকে কেটে হৃৎপিণ্ডকে উন্মুক্ত করেন এবং হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন কমিয়ে অপারেশনের মাধ্যমে হার্টের সমস্যাগুলো দূরীভূত করেন তাকে **ওপেন হার্ট সার্জারি** বলে। স্টেন্ট বা রিং এবং এনজিওপ্লাস্টির মাধ্যমে যখন সমস্যা সমাধান না হয় তখনই এই কঠিন সমস্যা দূর করার জন্য এই অপারেশন করা হয়। টরোন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক **Dr. Wilfred G. Bigelow** (1950) সর্বপ্রথম ওপেন হার্ট সার্জারি প্রয়োগ করেন।

CamScanner

যেসব কারণে ওপেন হার্ট সার্জারি করা হয় : ওপেন হার্ট সার্জারি নিম্নলিখিত কারণে হতে পারে। যথা—

১। হৃৎপিণ্ডে কোনো জন্মগত ত্রুটির কারণে।

২। করোনারি ধমনিতে একাধিক ব্লকেজ বা যেকোনো ধমনি ১০০% ব্লকেজ থাকার কারণে এই অপারেশন করা হয়। এই প্রক্রিয়াকে **করোনারি বাইপাস** বা **CABG** (Coronary Artery Bypass Graft) বলে।

৩। হৃৎপিণ্ডের কোনো কপাটিকার মেরামত বা প্রতিস্থাপন করা।

৪। হৃৎপিণ্ডে কোনো যন্ত্র বা পেসমেকার বসানো।

৫। হৃৎপিণ্ড নষ্ট হয়ে গেলে দাতার হৃৎপিণ্ড দ্বারা প্রতিস্থাপন করা।

ওপেন হার্ট সার্জারির প্রকারভেদ : ওপেন হার্ট সার্জারিতে চারটি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। যথা–

১। অন-পাম্প সার্জারি (On pump surgery) **:** এই ধরনের সার্জারিতে হৃৎপিণ্ডের মাধ্যমে রক্ত প্রবাহ বন্ধ রাখা হয়। এই সময় **হার্ট লাং মেশিনের** (heart-lung machine) সাহায্যে সমগ্র দেহে রক্ত সঞ্চালন অব্যাহত রাখা হয়। মেশিনটিতে সংরক্ষণ প্রকোষ্ঠ, O_2 প্রকোষ্ঠ বা বাক্স, পাম্প মেশিন ও টিউব থাকে। টিউবের একপ্রান্ত ডান অলিন্দের সাথে ও অপর প্রান্ত সিস্টেমিক মহাধমনির সাথে লাগানো হয়। উক্ত মেশিনের সাহায্যে হার্টের ডান অলিন্দ থেকে রক্ত একটি কক্ষে গ্রহণ করা হয় এবং সেখান থেকে রক্ত O_2 সমৃদ্ধ বাক্সে প্রবেশ করানো হয়। O_2 বাক্সের মধ্য দিয়ে পার হওয়ার সময় লোহিত কণিকা (RBC) O_2 গ্রহণ করে এবং অন্য একটি কক্ষে প্রবেশ করে। সেই কক্ষ থেকে পাম্প দ্বারা রক্ত শরীরের সব অঙ্গে পৌঁছে দেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে প্রথমে মেশিনের রক্ত নল দিয়ে মহাধমনিতে (aorta) প্রবেশ করে এবং পরবর্তীতে রক্ত রক্তনালি দিয়ে শরীরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

২। অফ-পাম্প সার্জারি (Off pump surgery or Beating heart) **:** এইক্ষেত্রে হার্ট লাং মেশিন ব্যবহার করা হয় না। এই ক্ষেত্রে হৃৎপিণ্ডকে সচল রেখে সার্জারি করা হয়। একে **অবক্যাব** (opcab) সার্জারি বলে।

৩। মিনিমালি ইনভেসিভ সার্জারি (Minimally invasive surgery) **:** এক্ষেত্রে বুকের খুব অল্প অংশ কাটা হয়। এক্ষেত্রে হার্ট লাং মেশিন ব্যবহারিত হতে পারে আবার নাও হতে পারে। একে **মিডক্যাব** (MIDCAB-Minimally Invasive Direct Coronary Artery Bypass) সার্জারি বলে।

৪। রোবট-সহযোগী সার্জারি (Robot-assisted surgery) **:** এ ধরনের সার্জারিতে রোগীর গায়ে খুবই সামান্য একটি কাটা দাগ থাকে। এ ধরনের সার্জারি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও সঠিক হয়ে থাকে। কারণ এ পদ্ধতিতে শল্যচিকিৎসকরা বিশেষ কম্পিউটার-নিয়ন্ত্রিত রোবটিক হাত (যান্ত্রিক হাত)-এর সাহায্যে অস্ত্রোপচার করেন। চিকিৎসক কম্পিউটার সার্জারির ত্রিমাত্রিক দৃশ্য দেখতে পান এবং কাজ সম্পন্ন করেন।

ওপেন হার্ট সার্জারির কৌশল

এই ধরনের চিকিৎসার জন্য **লাইফ সাপোর্ট যন্ত্র** ও **হৃদ-ফুসফুস মেশিন** বা **হার্ট লাং মেশিন** (heart-lung machine) ব্যবহার করা হয়। এতে একটি কার্ডিওভাস্কুলার শল্যচিকিৎসক দল জটিল অস্ত্রোপ্রচার পরিচালনা করেন। সার্জারি বা অপারেশনের শুরুতে চিকিৎসকের নির্দেশে **সাধারণ অ্যানেসথেসিয়া** (general anesthesia) বা **স্নায়ুবন্ধক অ্যানেসথেসিয়া** (nerve block anesthesia) দিয়ে রোগীকে অজ্ঞান করা হয়। অজ্ঞান করার প্রক্রিয়া ও কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস চালু হলেই শল্যচিকিৎসকরা অপারেশন শুরু করেন। সার্জারির সময় যেন রক্ত জমাট না বাঁধে সেজন্য হেপারিন ইনজেকশন ব্যবহার করা হয়। অপারেশনের শুরুতে প্রথমে সার্জন মাংস ও বুকের স্টার্নাম অস্থি ৮-৯ ইঞ্চি লম্বা করে কেটে আলাদা করেন তারপর বিশেষ ধরনের যন্ত্র দিয়ে এটিকে ফাঁক করে হার্টে পৌঁছান। তারপর হার্টের পেরিকার্ডিয়াম পর্দা কেটে হার্টকে হার্ট লাং মেশিনের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়।

হার্ট লাং মেশিন কাজ আরম্ভ করলে তখন হার্টের উপর অবস্থিত অ্যাওর্টার বা মহাধমনির রক্তসঞ্চালন বন্ধ করে হার্টকে রক্তনালি হতে বিচ্ছিন্ন করা হয়। সেই সঙ্গে অ্যাওর্টাতে একটি ইনজেকশনের মাধ্যমে হার্টবিট বন্ধ করা হয়। ফলে রোগী সম্পূর্ণভাবে বাইপাস মেশিনে চলে যায়। ফলে মেশিনের মাধ্যমে রোগীর দেহে রক্ত সঞ্চালিত হয়। এরপর সার্জনরা করোনারি বাইপাস সার্জারি আরম্ভ করেন।

CamScanner

অন্যদিকে, করোনারি আর্টারি বাইপাস সার্জারি বা হৃৎকপাটিকা মেরামত করার সময় বড় ধরনের কাটা-ছেঁড়া না করে বুকের মাঝামাঝি ছোট ফুটা করে ভেতরে ক্যামেরাযুক্ত যন্ত্র ঢুকিয়ে রোগীর অভ্যন্তরভাগ ভিডিও পর্দায় দেখা হয়। এ প্রক্রিয়ায় সার্জারি হলে সময় ও ব্যথা উভয়ই কম লাগে।

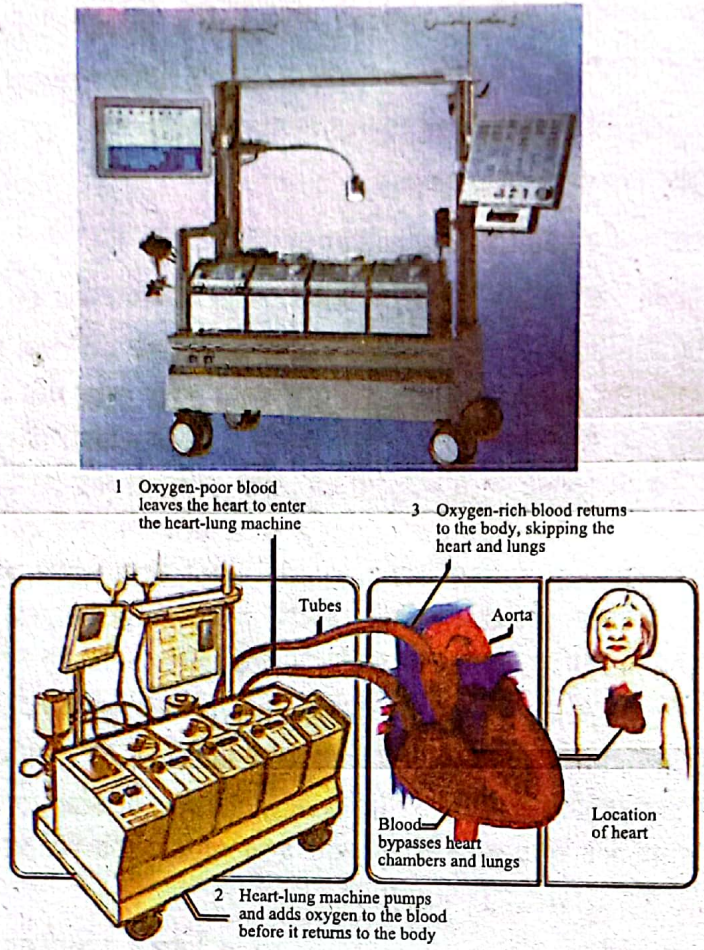

চিত্র ৪.১৬ : ওপেন হার্ট সার্জারিতে ব্যবহৃত হার্ট লাং মেশিন ও এর কার্যকারিতা

সাবধানতা :

ওপেন হার্ট সার্জারির রোগীদের কিছু সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। যেমন– সার্জারির পর রোগীকে **ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে** (intensive care unit-ICU) নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখতে হয়; ধূমপান সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করতে হবে; চর্বিমুক্ত খাবার খেতে হবে; উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখা; নিয়মিত চলাফেরা করা; স্বাস্থ্যসম্মত ওজন বজায় রাখা; চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ সেবন এবং যেকোনো শারীরিক সমস্যা মনে হলে সাথে সাথে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

করোনারি বাইপাস (Coronary Bypass)

চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় করোনারি বাইপাসকে **করোনারি আর্টারি বাইপাস গ্রাফট** বা **সিএবিজি** (Coronary Artery Bypass Graft/Grafting - CABG) সার্জারি বোঝায়। করোনারি ধমনিতে ব্লক হলে তা যদি **স্টেন্ট** বা রিং পরানো সম্ভব না হয় বা এনজিওপ্লাস্টি করে সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকে তাদের পরামর্শ দেওয়া হয় করোনারি বাইপাস সার্জারির। অর্থাৎ যাদের ব্লকেজের পরিমাণ বেশি, যেমন– ২টি করোনারি ধমনিতেই একাধিক ব্লকেজ কিংবা একটি ধমনিই পুরোপুরি বন্ধ। সেই ক্ষেত্রে এই ধরনের অপারেশন করা হয়। করোনারি বাইপাস সার্জারি ওপেন হার্ট সার্জারির অন্তর্গত।

করোনারি হৃদরোগ সৃষ্টির প্রধান কারণ হচ্ছে– করোনারি ধমনির রুদ্ধতা। ধমনির অন্তঃস্থ প্রাচীর ঘিরে উচ্চমাত্রার কোলেস্টেরল জাতীয় হলদে রং-এ চর্বি সঞ্চিত হয়ে করোনারি হৃদরোগে সৃষ্টি করে। ধমনি প্রাচীরের এন্ডোথেলিয়ামে এগুলো জমা হয়। পরে এসব পদার্থে তন্তু পুঞ্জীভূত হয়ে শক্ত চুনময় পদার্থে পরিণত হয়। এসব পদার্থের আধিক্যের কারণে ধমনিপথ সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। ফলে রক্তপ্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয় অথবা বন্ধ হয়ে যায়। এ অবস্থায় হৃৎপেশি অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত না পেলে হার্ট অ্যাটাক, হার্ট ফেইলিউর প্রভৃতি জটিলতার সৃষ্টি হয়। এ ধরনের পরিস্থিতিতে করোনারি বাইপাস সার্জারি মতো জটিল প্রক্রিয়ায় অগ্রসর হতে হয়।

CamScanner

এ পদ্ধতিতে রোগীর বুকের হাড়টিকে ইলেকট্রিক করাত দিয়ে কেটে বিশেষ ধরনের টেনে আনার মেশিন দিয়ে ফাঁক করে হার্টটিকে মুক্ত করা হয়। অতঃপর ধমনির যেসব স্থানে ব্লক আছে, সেখানে শরীরের অন্যস্থানের (যেমন– পায়ের বা হাতের) একটি শিরা বা ধমনি (গ্রাফট) দিয়ে বন্ধ রক্তনালির পাশ দিয়ে নতুন রক্তনালি সংস্থাপন করে রক্ত প্রবাহ স্বাভাবিক করে দেওয়া হয়। এ কারণেই এই অস্ত্রোপচারকে **করোনারি আর্টারি বাইপাস গ্রাফটিং** বা সিএবিজি (CABG) বলে। অপারেশনের সময় সংগৃহীত পায়ের শিরার একপ্রান্ত হার্টের উপরিভাগে অবস্থিত অ্যাওর্টার সাথে এবং অপর প্রান্ত রক্তনালির বন্ধ হয়ে যাওয়া অংশকে পাশ কাটিয়ে ঐ একই রক্তনালির সাথে জোড়া দিয়ে দেওয়া হয়। এতে হার্ট লাং মেশিন ব্যবহার করা হয় যাতে সূক্ষ্ম শিরাগুলো যথাযথ ও সঠিকভাবে যুক্ত করা যায়। সাধারণত ৩-৫ ঘন্টার মধ্যে বাইপাস সার্জারির কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। রোগীকে ২-৩ দিন হাসপাতালে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়। দুই মাসের মধ্যে রোগী সুস্থ হয়ে যান। সিএবিজি অপারেশনের রোগীর পা এবং হাতে কাটা দাগ থেকে যায়।

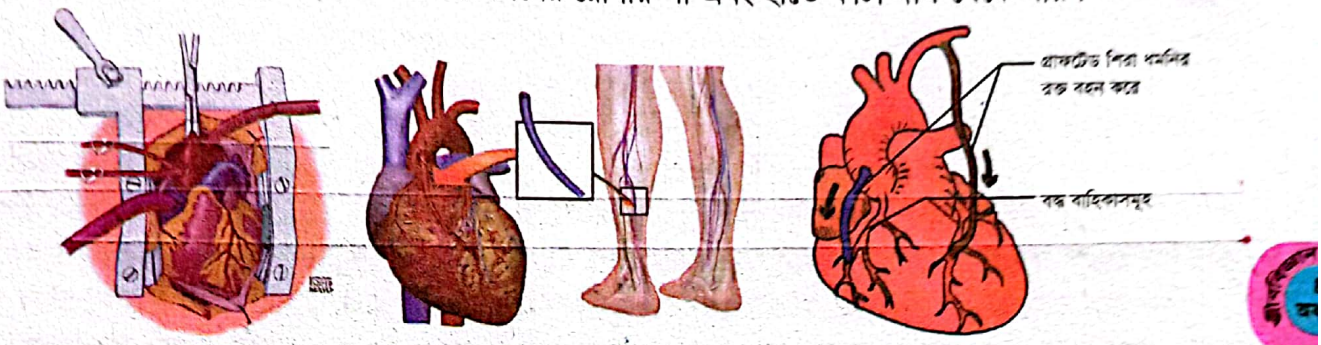

ক খ গ ঘ

চিত্র ৪.১৯ : করোনারি বাইপাস সার্জারি : (ক) উন্মুক্ত হার্ট, (খ ও গ) বাম পা থেকে শিরা এনে করোনারি ধমনিতে সংযোজন, (ঘ) করোনারি বাইপাস করা হার্ট

সাবধানতা

বাইপাস সার্জারির পর রোগীকে সাবধানতার সাথে কিছু সাধারণ নিয়ম মেনে চলতে হয়। যেমন– সার্জারির পর রোগীকে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখতে হয়; ধূমপান সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করা; চর্বিমুক্ত খাবার খাওয়া; উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখা; নিয়মিত পরিমিত ব্যায়াম করা; স্বাস্থ্যসম্মত ওজন বজায় রাখা; চাপ ও রাগ নিয়ন্ত্রণে আনা; চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ সেবন এবং চিকিৎসকের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা।

এনজিওপ্লাস্টি (Angioplasty)

এনজিওপ্লাস্টি হচ্ছে এক ধরনের চিকিৎসা যার সাহায্যে ধমনির যে অংশে কোলেস্টেরল জমে ব্লকেজ ও রক্ত চলাচলে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছে। সেই জায়গাটিকে প্রসারিত করা হয়। একে **পারকিউটেনাস করোনারি ইন্টারভেনশন** (Percutaneous Coronary Intervention- PCI) বা Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty (PTCA) বলা হয়। এক্ষেত্রে হৃৎপিণ্ডের বড় ধরনের অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন পড়ে না, কেবল করোনারি ধমনির ভেতর **ক্যাথেটার** (catheter) প্রবেশ করিয়ে ধমনিকে প্রশস্ত রাখার ব্যবস্থা করা হয়। প্রাথমিকভাবে এনজিওগ্রাম করে ধমনিতে ব্লকেজের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। তারপর রোগীর শারীরিক অবস্থা ও ব্লকেজের পরিমাণ অনুসারে **এনজিওপ্লাস্টি** অথবা বাইপাস সার্জারি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সাধারণত অ্যানজাইনা ও হার্ট অ্যাটাকের হৃৎরোগীদের করোনারি এনজিওপ্লাস্টি করাতে হয়। সুইজারল্যান্ডের ডা. অ্যানড্রেস গ্রয়েন জিগ ১৯৭৭ সালে সর্বপ্রথম এ পদ্ধতি প্রয়োগ করেন।

এনজিওপ্লাস্টির প্রকারভেদ : এনজিওপ্লাস্টি মূলত দু'ধরনের, যথা– বেলুনিং এবং স্টেন্টিং বা রিং পরানো।

১। বেলুনিং (Ballooning) : এ পদ্ধতিতে ধমনির যে জায়গায় ব্লকেজ রয়েছে সেখানে ক্যাথেটারের (লম্বা সরু তারবিশেষ) সাহায্যে একটি বেলুন প্রবেশ করানো হয়। তারপর সেই বেলুনটিকে ফুলিয়ে দিয়ে সেই জায়গাটিকে প্রসারিত করা হয়।

ক. খ. গ.

চিত্র ৪.২০ : বেলুন এনজিওপ্লাস্টি : ক. প্লাক জমে ধমনির লুমেন প্রায় বন্ধ, খ. উন্মুক্ত বেলুন ও গ. প্রশস্ত ধমনি লুমেন

২। স্টেন্টিং বা রিং পরানো (Stenting) : এ পদ্ধতিতে আগের মতোই ক্যাথেটারের (catheter) সাহায্যে বেলুন ঢুকিয়ে ধমনির সংকুচিত অংশটিকে প্রসারিত করা হয়। তারপর সেখানে একটি **স্টেন্ট** বা **ধাতব রিং** (বিশেষ প্রক্রিয়ায় নির্মিত) প্রবেশ করিয়ে সেটা স্থাপন করা হয় যাতে তা ধমনিকে প্রসারিত করে রাখার মাধ্যমে স্বাভাবিক রক্তপ্রবাহে সহায়তা করে। রিং দু'ধরনের যথা : **মেডিকেটেড স্টেন্ট** অর্থাৎ রিং-এর গায়ে ওষুধ লাগিয়ে দেওয়া হয় যাতে পুনঃ ব্লকেজ প্রতিরোধ করা যেতে পারে এবং অপরটি **নন মেডিকেটেড স্টেন্ট**। করোনারি ধমনিতে ব্লকেজের পরিমাণ ৭০-৮০% কিংবা যাদের দুটি করোনারি ধমনিতে ৫০-৬০% ব্লকেজ এবং একটিতে ৮০% ব্লকেজ, তাদের শুধু ৮০% ব্লকড ধমনিতে স্টেন্টিং করা হয়। প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে ৩০ মিনিট থেকে কয়েক ঘণ্টা সময় লাগে।

এনজিওপ্লাস্টির (স্টেন্টিং বা রিং পরানো) কৌশল

এনজিওপ্লাস্টির শুরুতে রোগীর হৃৎস্পন্দন, রক্তচাপ, ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। রোগী যাতে ব্যথা অনুভব না করে তার জন্য কুঁচকি বা বাহুর ত্বকে লোকাল অ্যানেসথেসিয়া দিয়ে অবশ করা হয়। কুঁচকির অথবা বাহুর (catheter) প্রধান রক্তনালিতে মোটা সুঁই বা নিডলের সাহায্যে একটি ছিদ্র করা হয়। এরপর ছিদ্রটির মধ্যদিয়ে একটি গাইড ক্যাথেটার (guide catheter-একটি সরু, নমনীয় ও লম্বা টিউব) ঢুকানো হয়। ক্যাথেটারের অবস্থান পর্যবেক্ষণের জন্য চিকিৎসক একটি X-ray মনিটর এবং ধমনির প্লাক অঞ্চল চিহ্নিতকরণের জন্য ক্যাথেটারটির মধ্যে এক ধরনের রঞ্জক পদার্থ ইনজেকশনের সাহায্যে প্রবেশ করানো হয়। এ পদ্ধতিকে **ফ্লুরোস্কোপি** (fluoroscopy) বলে। এ ধরনের রঞ্জক সুনির্দিষ্ট অঞ্চলে ক্যাথেটার পৌছালো কিনা তা পর্যবেক্ষণে সহায়তা করে। রোগী নিজেও এটি পর্যবেক্ষণ করতে পারে।

গাইড ক্যাথেটারের প্রান্তটি শেষ পর্যন্ত করোনারি ধমনির অ্যাথারোমা (প্লাক বা করোনারি ধমনির ব্লক) গঠিত সরু অংশে প্রবেশ করানো হয়। এরপর রক্তনালিতে গাইড ক্যাথেটারের মাধ্যমে একটি **বেলুন ক্যাথেটার** (balloon catheter) প্রবেশ করানো হয়। এর প্রান্তে একটি **বেলুন** ও একটি **স্টেন্ট** (ধাতুর তৈরি তারের জালিকার মতো কয়েক সেন্টিমিটার লম্বা খাঁচা। এটি সুতার তৈরিও হতে পারে) থাকে। করোনারি ধমনির অ্যাথারোমা অংশে বেলুন ও স্টেন্ট প্রবেশ করানোর পর কয়েক সেকেন্ডের (৩০-৬০ সেকেন্ড) মধ্যে বেলুনটি ফোলানো হয়। ফলে ধমনির অ্যাথারোমার চর্বিগুলো নিষ্পেশিত হয়ে সরু ধমনিকে প্রশস্ত করে। এর ফলে ধমনির ভেতর দিয়ে রক্ত স্বাভাবিকভাবে প্রবাহিত হতে শুরু করে। চর্বিগুলো নিষ্পেশিত হওয়ার সময় কিছুক্ষণের জন্য বুকে অ্যানজাইনার মতো তীব্র ব্যথা অনুভূত হতে পারে। এরপর বেলুনটি চুপসিয়ে বেলুনসহ ক্যাথেটার বাইরে বের করে আনা হয়। কিন্তু স্টেন্টটি ধমনির ভেতরেই রেখে দেওয়া হয়। এটি সর্বদা ধমনির প্রাচীরকে বাইরের দিক চেপে রাখে বলে ধমনিতে সহজে অ্যাথারোমা বা ব্লক তৈরি হতে পারে না। স্টেন্টটির গায়ে এক ধরনের ওষুধের প্রলেপ লাগানো হয়। এটি চর্বি গলিয়ে ধমনিকে পুনরায় সরু হওয়া থেকে রক্ষা করে। করোনারি ধমনির একাধিক স্থানে অ্যাথারোমা বা ব্লক থাকলে একাধিক স্থানেই স্টেন্ট অ্যানজিওপ্লাস্ট করা যায়। প্রতিটি স্টেন্ট অ্যানজিওপ্লাস্টিতে প্রায় ৩০ মিনিট সময় লাগে। তবে ব্লকের সংখ্যা ও ধরণ অনুসারে তা কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত লাগতে পারে। চিকিৎসক রোগীকে অপারেশনের পর নিবিড় পর্যবেক্ষণে একদিন বা তারও বেশি রাখতে পারেন। **সাধারণভাবে স্টেন্টের মাধ্যমে এনজিওপ্লাস্টিকে রিং পরানো বলে।**

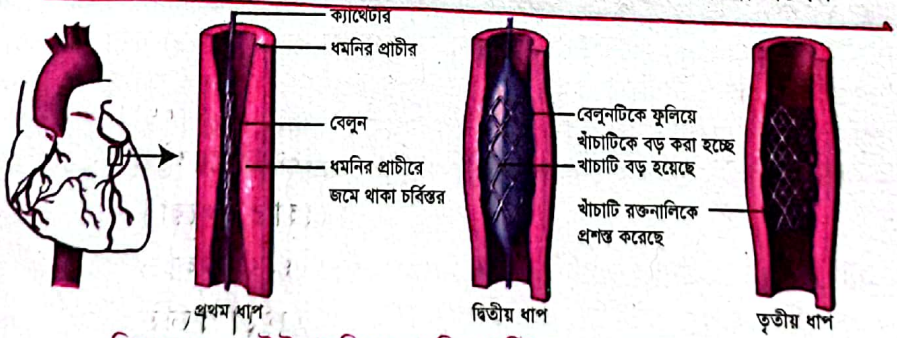

চিত্র ৪.২১ : স্টেন্ট পদ্ধতিতে এনজিওপ্লাস্টি করার ধাপসমূহ

বর্তমানে চিকিৎসকগণ উপরোক্ত এনজিওপ্লাস্টি ছাড়াও **লেজার এনজিওপ্লাস্টি** এবং **করোনারি অ্যাথেরেকটমির** মাধ্যমে হৃদরোগের চিকিৎসা করে থাকেন।

লেজার এনজিওপ্লাস্টি : এ ধরনের এনজিওপ্লাস্টিতে বেলুনের পরিবর্তে ক্যাথেটারের শীর্ষে একটি লেজার লাগানো থাকে। করোনারি ধমনির প্লাকযুক্ত অংশে লেজার রশ্মি পৌঁছে স্তরে স্তরে প্লাক ধ্বংস করে এবং গ্যাসীয় কণায় বাষ্পীভূত করে দেয়। এ প্রক্রিয়াটি লেজার ছাড়া, বেলুন এনজিওপ্লাস্টির পাশাপাশিও প্রয়োগ করা যায়।

CamScanner

করোনারি অ্যাথেরেকটমি : এটিও এনজিওপ্লাস্টির মতো একটি পদ্ধতি, তবে এ প্রযুক্তিতে ধমনি প্রাচীরের প্লাককে বেলুনের সাহায্যে চেপে ল্যুমেন প্রশস্ত করার পরিবর্তে ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্র, যেমন– ব্লেড, ক্ষুদ্র ঘূর্ণী ব্লেড, বেলুন, ড্রিল ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়।

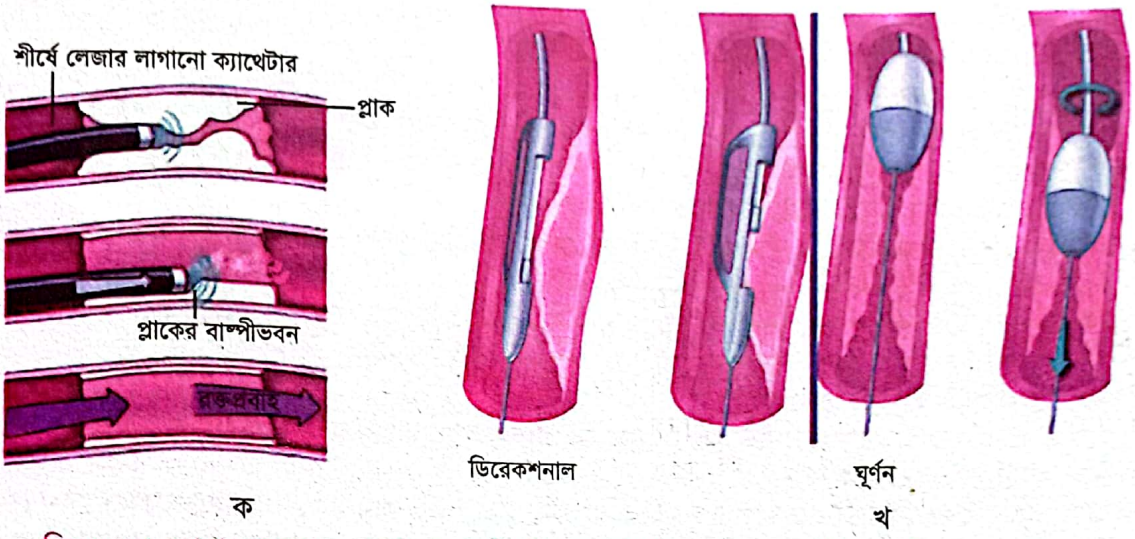

চিত্র ৪.২২ : (ক) লেজার ও (খ) করোনারি অ্যাথেরেকটমি পদ্ধতিতে এনজিওপ্লাস্টি করার ধাপসমূহ

এনজিওপ্লাস্টির উপকারিতা

করোনারি হৃদরোগের অন্যতম প্রধান রোগ সৃষ্টি হয় করোনারি ধমনিতে। ধমনির ভেতর ব্লক সৃষ্টি হলে পর্যাপ্ত অক্সিজেন O_2 সমৃদ্ধ রক্ত হৃৎপেশিতে সংবহিত হতে পারে না। ফলে হার্ট ফেইলিউর ও হার্ট অ্যার্টাকের মতো মারাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। এরূপ মারাত্মক অবস্থা মোকাবেলায় এনজিওপ্লাস্টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

এনজিওপ্লাস্টি ধমনির ল্যুমেন থেকে ব্লক অপসারণ করতে পারে। তাছাড়া শ্বাসকষ্ট ও বুকে ব্যথা উপশম হয়। এ পদ্ধতিটি হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা কমিয়ে জীবন রক্ষায় অবদান রাখে। বুক উন্মুক্ত করতে হয় না বলে, সংক্রমণ ও দীর্ঘকালীন সতর্কতার প্রয়োজন পড়ে না। মাত্র কয়েক ঘণ্টায় জীবন রক্ষাকারী এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে পারে এবং কয়েক দিন পর থেকেই হালকা কাজকর্ম করা সম্ভব। সুস্থ হতে ৪ সপ্তাহের বেশি লাগে না।

এনজিওপ্লাস্টির ঝুঁকি

এনজিওপ্লাস্টি বেশ ঝুঁকিপূর্ণ প্রক্রিয়া। প্রক্রিয়ার শুরুতে, বিশেষত স্টেন্টিং করার সময় ২% রোগীর ক্ষেত্রে হার্ট অ্যাটাক হয়ে যেতে পারে। আবার যে রক্তনালির মধ্য দিয়ে ক্যাথেটার ঢুকানো হয়, সেখান থেকে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের সম্ভাবনা থাকে। আবার বেলুনিং-এর সময় বেলুন ছিঁড়ে যেতে পারে অথবা স্টেন্টিং-এর সময় স্টেন্ট চুপসে রক্ত চলাচল পুরোপুরি বন্ধ হয়ে হার্ট অ্যাটাক হতে পারে। এনজিওপ্লাস্টি করার পরও রোগীর বিপদের সম্ভাবনা থাকে। অনেক ক্ষেত্রে স্টেন্ট লাগানো অংশটিতে রক্ত জমাট বাঁধে এবং জমাটবদ্ধ রক্ত ছুটে গিয়ে মস্তিষ্কের কোনো রক্তনালিকে আক্রান্ত করে স্ট্রোক ঘটাতে পারে। আবার কোনো কোনো রোগী পুনরায় ব্লকেজে আক্রান্ত হতে পারে। সর্বোপরি এনজিওপ্লাস্টি একটি ব্যয়বহুল চিকিৎসা। একটি বেসরকারি হৃদরোগ হাসপাতালে বেলুনিং-এর জন্য খরচ হয় ৭৫ হাজার টাকা। স্টেন্টিং-এর ক্ষেত্রে প্রতিটি মেডিকেটেড রিং-এর মূল্য ৮০ হাজার থেকে দুই লাখ টাকা। নন মেডিকেটেড রিং-এর মূল্য ৫০ হাজার থেকে ৮০ হাজার টাকা, এছাড়া বাড়তি ওষুধপত্র ও হাসপাতালের খরচ যুক্ত হয়ে ব্যয়ের পরিমাণ প্রায় তিন থেকে চার লাখ টাকা দাঁড়ায়।

তাছাড়া যারা বৃক্কের অসুখে ভুগছেন, কিংবা এনজিওগ্রামের সময় রঞ্জকের প্রতি অ্যালার্জি দেখা দেয় এবং যাদের বয়স ৭৫ বছরের বেশি তাদের ক্ষেত্রে এনজিওপ্লাস্টি কিছুটা অসুবিধাজনক হতে পারে।

❑ **কাজ :** (i) এনজিওপ্লাস্টি হৃৎপিণ্ডে রোগ নিরাময়ে কতটুকু সহায়ক হবে– বিশ্লেষণ কর। (ii) এনজিওপ্লাস্টি সম্পর্কে আলোচনা কর।

CamScanner

সারসংক্ষেপ

- **রক্ত সংবহনতন্ত্র :** দেহের বিভিন্ন অংশে রক্ত সংবহনের জন্য বিভিন্ন অঙ্গের পারস্পরিক সহযোগিতায় যে অঙ্গতন্ত্র গড়ে ওঠে, তাকে রক্ত সংবহনতন্ত্র বলে। এ তন্ত্র রক্ত, হৃৎপিণ্ড ও রক্তবাহিকা নিয়ে গঠিত।
- **রক্ত :** রক্ত এক প্রকার বিশেষ ধরনের প্রবাহমান তরল যোজক কলা, যা রক্তরস ও রক্তকণিকা নিয়ে গঠিত। রক্তকণিকা তিন প্রকার, যথা– লোহিত রক্তকণিকা, শ্বেত রক্তকণিকা ও অনুচক্রিকা।
- **রক্তরস :** রক্তরস বা প্লাজমা হচ্ছে রক্তের ঈষৎ ক্ষারধর্মী হালকা হলুদ বর্ণের অকোষীয় তরল অংশ। এতে পানির পরিমাণ ৯০-৯২% এবং দ্রবীভূত কঠিন পদার্থের পরিমাণ ৮-১০%। প্লাজমা রক্তকণিকাসমূহ ধারণ করে এবং রক্তের তারল্যতা রক্ষা করে।
- **এরিথ্রোসাইট বা লোহিত রক্তকণিকা বা হিমাটিড :** লোহিত রক্তকণিকা হলো রক্তরসে বিদ্যমান লালবর্ণের, বৃত্তাকার, দ্বি-অবতল, নিউক্লিয়াসবিহীন ও চাকতির মতো গঠনবিশিষ্ট রক্তকণিকা।
- **লিউকোসাইট বা শ্বেত রক্তকণিকা :** রক্তরসে বিদ্যমান স্বচ্ছ, নিউক্লিয়াসযুক্ত, দানাদার বা অদানাদার, অনিয়তাকার গঠনবিশিষ্ট রক্তকণিকাকে লিউকোসাইট বা শ্বেত রক্তকণিকা বলে।
- **আণুবীক্ষণিক সৈনিক :** রক্তের লিম্ফোসাইটগুলো অ্যান্টিবডি সৃষ্টি করে রোগ প্রতিরোধ করে বলে এদের আণুবীক্ষণিক সৈনিক বলে।
- **থ্রোম্বাসাইট বা অনুচক্রিকা :** রক্তে বিদ্যমান বর্ণহীন, ক্ষুদ্র, নিউক্লিয়াসবিহীন, গোলাকার বা ডিম্বাকার বা দণ্ডাকার রক্তকণিকাকে থ্রোম্বাসাইট বা অনুচক্রিকা বলে।
- **সিরাম :** রক্ত জমাট বাঁধার পর রক্তের জমাট অংশ থেকে যে হালকা হলুদ রঙের স্বচ্ছ জলীয় অংশ নির্গত হয় তাকে সিরাম বলে। সিরামে ফাইব্রিনোজেন থাকে না।
- **হিমোস্ট্যাটিক প্লাগ :** রক্তনালি ক্ষতিগ্রস্ত হলে রক্তনালির আবরণী কলা ভেঙে যায় এবং তার নিচের কোলাজেন তন্তু বেরিয়ে পড়ে। কোলাজেন তন্তু অনুচক্রিকাকে আকর্ষণ করে। অনুচক্রিকাগুলো কোলাজেনে আটকে গিয়ে সেরোটোনিন ও ADP ক্ষরণ করে। ফলে আরও অনুচক্রিকা ক্ষতস্থানে জড়ো হয়ে ক্ষতস্থানে শিথিল প্লাগ বা ছিপির সৃষ্টি করে। একে হিমোস্ট্যাটিক প্লাগ বলে। এই প্লাগ হেপারিন জাতীয় তঞ্চনবিরোধী দ্বারা প্রভাবিত হয় না।
- **রক্ততঞ্চন :** যে প্রক্রিয়ায় কোনো ক্ষতের মুখে রক্ত জমাট বেঁধে দেহ থেকে অবাঞ্ছিত রক্তপাত বন্ধ হয় তাকে রক্ততঞ্চন বা রক্ত জমাট বাঁধা বলে।
- **লসিকা :** প্রধানত কৈশিক জালিকার ভেদ্য প্রাচীরের মাধ্যমে রক্তের যে তরল অংশ বের হয়ে শিরা ও ধমনির জালকের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করে দেহের প্রতিটি কোষকে সিক্ত রাখে তাকে লসিকা বলে।
- **লসিকাবাহ :** যে বিশেষ ধরনের নালিকার মাধ্যমে লসিকা সমগ্র দেহে পরিবাহিত হয় তাদের লসিকাবাহ বা লসিকানালি বলে।
- **লসিকা গ্রন্থি :** লসিকানালির স্বল্প ব্যবধানে বহু গোলাকার বা ডিম্বাকার বা বৃক্কাকার স্ফীত অংশ থাকে, এদের লসিকা গ্রন্থি বা লসিকা পর্ব বলে।
- **কলারস :** আন্তঃকোষীয় স্থানে অবস্থানকারী যে স্বচ্ছ, বর্ণহীন তরল কলাকোষগুলোকে পুষ্টি প্রদান করে তাকে কলারস বা টিস্যু ফ্লুয়িড বলে।
- **হৃৎপিণ্ড :** হৃৎপিণ্ড হলো রক্তসঞ্চালন প্রক্রিয়ার জন্য চাপ সৃষ্টিকারী মাংসল ফাঁপা, বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে বিভক্ত, সর্বক্ষণ নির্দিষ্ট ছন্দ ও হারে স্পন্দনশীল একটি প্রধান কেন্দ্রীয় যন্ত্র বিশেষ। যাকে সজীব পাম্পিং অঙ্গও বলা হয়। অর্থাৎ মানুষের রক্ত সংবহনতন্ত্রের কেন্দ্রীয় পাম্প যন্ত্র হলো হৃৎপিণ্ড। এটি সর্বদা একটি ছন্দোময় সংকোচন-প্রসারণ ক্রিয়ার মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে ফিরে আসা রক্ত সংগ্রহ করে এবং পুনরায় সমগ্র দেহে রক্ত প্রেরণ করে।
- **কলামনি কার্নি :** হৃৎপিণ্ডের ভেন্ট্রিকল বা নিলয় প্রাচীরের অন্তর্গাত্র হতে কতগুলো মাংসল পেশি ভেন্ট্রিকল প্রকোষ্ঠে অভিক্ষেপিত অবস্থায় থাকে। এদের কলামনি কার্নি বলে।
- **দ্বি-বর্তনী সংবহন :** যে রক্ত সংবহনতন্ত্রে রক্ত সমগ্র দেহে একবার পরিপূর্ণ চক্র সম্পন্ন করার পূর্বে হৃৎপিণ্ড দিয়ে দুবার প্রবাহিত হয় তাকে দ্বি-বর্তনী সংবহন বা দ্বৈত সংবহন বলে। সিস্টেমিক সংবহন ও পালমোনারি সংবহন নিয়ে এ ধরনের চক্র গঠিত। এটি অক্সিজেনেটেড ও ডিঅক্সিজেনেটেড রক্তের মিশ্রণে বাধা দেয়, অক্সিজেনেটেড ব্লাড অধিক অক্সিজেন বহন করে এবং ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাড অধিক কার্বন ডাইঅক্সাইড বহন করে দেহ থেকে অপসারণের জন্য।
- **হার্টবিট :** হৃৎপিণ্ডের সংকোচন ও প্রসারণ বা স্পন্দন ছন্দময় গতিতে অবিরাম চলতে থাকে। হৃৎপিণ্ডের একবার সংকোচন (সিস্টোল) ও একবার প্রসারণ (ডায়াস্টোল)-কে একত্রে হার্টবিট বা হৃৎস্পন্দন বলে। একজন প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ মানুষের হৃৎস্পন্দনের হার প্রতি মিনিটে প্রায় ৭০-৮০ বার।
- **কার্ডিয়াক চক্র :** হৃৎস্পন্দনের সময় হৃৎপিণ্ডের অভ্যন্তরে রক্ত চলাচলের জন্য ধারাবাহিকভাবে কতকগুলো ঘটনা ঘটে। একটি হৃৎস্পন্দন বা হার্টবিট সম্পন্ন করতে হৃৎপিণ্ডে পরপর সংঘটিত ঘটনার সমষ্টিকে কার্ডিয়াক চক্র বা হৃৎচক্র বলে।
- **মায়োজেনিক হৃৎপিণ্ড :** মানুষের হৃৎপিণ্ড স্নায়ুতন্ত্র, হরমোন বা অন্য কোনো উদ্দীপনা ছাড়াই নিজেই স্পন্দন তৈরি করতে পারে। এজন্য একে মায়োজেনিক হৃৎপিণ্ড বলে।
- **মায়োজেনিক নিয়ন্ত্রণ :** মানুষসহ বিভিন্ন স্তন্যপায়ী প্রাণীর হৃৎপিণ্ড স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংকুচিত-প্রসারিত হয়ে সমগ্র দেহে রক্ত সঞ্চালন ঘটায়। এতে প্রচণ্ড গতিতে রক্ত প্রবাহিত হয়। বাইরের কোনো উদ্দীপনা ছাড়াই হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। এই ধরনের নিয়ন্ত্রণকে মায়োজেনিক নিয়ন্ত্রণ বলে। বিশেষ চার ধরনের সংযোগী কলা বা টিস্যু হৃৎস্পন্দন নিয়ন্ত্রণ করে।

CamScanner

☑ **রক্তচাপ :** রক্ত রক্তবাহিকার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় রক্তবাহিকার প্রাচীরে (প্রধানত ধমনির প্রাচীরে) যে পার্শ্বীয় চাপ প্রয়োগ করে তাকে রক্তচাপ বলে। পূর্ণ বয়স্ক সুস্থ মানুষের দেহের স্বাভাবিক রক্তচাপ ১২০/৮০ mm Hg.

☑ **ধমনি রক্তচাপ :** ধমনিতে প্রবহমান রক্ত ধমনিগাত্রে যে পার্শ্বচাপ প্রয়োগ করে তাকে ধমনি রক্তচাপ বলে। রক্তচাপ বলতে সাধারণভাবে ধমনি রক্তচাপকেই বোঝায়।

☑ **হাইপারটেনশন :** নির্দিষ্ট বয়সে মানুষের সুস্থ শরীরে যে রক্তচাপ থাকা দরকার তার চেয়ে বেশি পরিমাণের রক্তচাপ সর্বদা বিদ্যমান থাকলে তাকে উচ্চ রক্তচাপ বা হাইপারটেনশন বলে।

☑ **ব্যারোরিসেপ্টর :** রক্তনালির প্রাচীরে বিদ্যমান কতগুলো সংবেদী স্নায়ুপ্রান্ত, যা রক্তচাপ পরিবর্তনে বিশেষভাবে সাড়া দেয়। সেই স্নায়ুপ্রান্তকে ব্যারোরিসেপ্টর বলে। এরা রক্তচাপ পরিবর্তনে সাড়া দিয়ে দেহে রক্তচাপের ভারসাম্য বা হোমিওস্ট্যাসিস বজায় রাখে। মানুষের দেহের উর্ধ্বাংশে বৃহৎ ধমনির বিভক্তি অঞ্চলে, যেমন– অ্যাওর্টিক আর্চ, ক্যারোটিড ধমনি ইত্যাদিতে এদের পাওয়া যায়।

☑ **ব্যারোরিফ্লেক্স :** রক্তনালির প্রাচীরে অবস্থিত বিশেষ সংবেদী স্নায়ুপ্রান্তকে ব্যারোরিসেপ্টর বলে। রক্তনালিতে কোনো কারণে অস্বাভাবিক রক্তচাপ সৃষ্টি হলে ব্যারোরিসেপ্টর খুব দ্রুত এই উদ্দীপনা গ্রহণ করে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে প্রেরণ করে। এরপর কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র রক্তনালি ও হৃৎপিণ্ড পরিচলনার মাধ্যমে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে। এই পদ্ধতিকে ব্যারোরিফ্লেক্স বলে।

☑ **আয়তনরিসেপ্টর :** শিরা, হৃৎপিণ্ডের ডান অলিন্দ, ডান নিলয়, পালমোনারি ধমনি ও পালমোনারি শিরায় যেখানে রক্তের চাপ কম থাকে সেখানকার ব্যারোরিসেপ্টরগুলোকে আয়তনরিসেপ্টর বলে।

☑ **রক্তবাহিকা :** যেসব নালিকার মাধ্যমে রক্ত বাহিত হয় অর্থাৎ রক্ত হৃৎপিণ্ড থেকে দেহের বিভিন্ন অংশে বাহিত হয় এবং দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে পুনরায় হৃৎপিণ্ড ফিরে আসে, সেগুলোকে রক্তবাহিকা বলে। তিন ধরনের রক্তবাহিকা দ্বারা রক্ত পরিবাহিত হয়, যথা– ধমনি, শিরা ও কৈশিক জালিকা।

☑ **ধমনি :** যেসব রক্ত নালিকার মাধ্যমে O_2 সমৃদ্ধ রক্ত হৃৎপিণ্ড থেকে দেহের বিভিন্ন অংশে প্রেরিত হয় তাদের ধমনি বলে (ব্যতিক্রম– পালমোনারি ধমনি)।

☑ **শিরা :** যেসব রক্তনালিকার মাধ্যমে CO_2 সমৃদ্ধ রক্ত দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে তাদের শিরা বলে (ব্যতিক্রম– পালমোনারি শিরা)।

☑ **কৈশিক জালিকা :** কোষ-কলার ফাঁকে ফাঁকে জালিকার ন্যায় বিস্তৃত, সূক্ষ্ম প্রাচীরবিশিষ্ট, অতি সরু আণুবীক্ষণিক রক্তনালিকাকে কৈশিক জালিকা বলে।

☑ **সিস্টেমিক সংবহন :** যে সংবহনে রক্ত হৃৎপিণ্ডের বাম ভেন্ট্রিকল থেকে শুরু করে দেহের বিভিন্ন অংশ হতে ডান অ্যাট্রিয়ামে পৌঁছায় তাকে সিস্টেমিক সংবহন বলে। এই সংবহনে O_2 সমৃদ্ধ রক্ত হৃৎপিণ্ডের বাম ভেন্ট্রিকল থেকে ধমনির মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন অংশের জালকে ছড়িয়ে পড়ে এবং ঐ সকল জালক থেকে CO_2 সমৃদ্ধ রক্ত শিরার মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের ডান অ্যাট্রিয়ামে ফিরে আসে অর্থাৎ এই সংবহনের মাধ্যমে দেহের সকল কোষ, টিস্যু ও অঙ্গে O_2 সমৃদ্ধ রক্ত সরবরাহ হয় এবং CO_2 সমৃদ্ধ রক্ত হৃৎপিণ্ডে ফেরত আসে।

☑ **পালমোনারি সংবহন :** যে সংবহনে রক্ত ডান ভেন্ট্রিকল থেকে ফুসফুসে গমন করে এবং ফুসফুস থেকে বাম অ্যাট্রিয়ামে পুনরায় ফেরত আসে তাকে পালমোনারি সংবহন বলে। অর্থাৎ এই সংবহনে হৃৎপিণ্ডের ডান ভেন্ট্রিকল থেকে CO_2 সমৃদ্ধ রক্ত পালমোনারি ধমনির মাধ্যমে ফুসফুসে যায় এবং ফুসফুস থেকে পালমোনারি শিরার মাধ্যমে O_2 সমৃদ্ধ রক্ত হৃৎপিণ্ডের বাম অ্যাট্রিয়ামে ফিরে আসে।

☑ **করোনারি সংবহন :** যে সংবহনে রক্ত হৃৎপিণ্ডের নিজস্ব পেশিতে অর্থাৎ হৃৎপিণ্ডের প্রাচীরে সংবাহিত হয় তাকে করোনারি সংবহন বলে। এই সংবহনে হৃৎপিণ্ডের বাম ভেন্ট্রিকল থেকে O_2 সমৃদ্ধ রক্ত করোনারি ধমনির মাধ্যমে হৃৎপেশিতে সরবরাহ হয় এবং হৃৎপেশি থেকে CO_2 সমৃদ্ধ রক্ত করোনারি শিরার মাধ্যমে করোনারি সাইনাস হয়ে হৃৎপিণ্ডের ডান অ্যাট্রিয়ামে ফিরে আসে। অর্থাৎ এই ধরনের সংবহন হৃৎপেশি ও হৃৎপিণ্ডের মধ্যে ঘটে।

☑ **পোর্টাল সংবহন :** কোনো কোনো অঙ্গে কৈশিক জালিকা থেকে উৎপন্ন শিরা হৃৎপিণ্ডের দিকে অগ্রসর হওয়ার পথে অন্য একটি মাধ্যমিক অঙ্গে প্রবেশ করে এবং সেখানে পুনরায় কৈশিক জালিকায় বিভক্ত হয় তাকে পোর্টাল শিরা বলে। পোর্টাল শিরার মাধ্যমে রক্তসংবহন ব্যবস্থাকে পোর্টাল সংবহন বলে। এই সংবহনে রক্ত হৃৎপিণ্ড থেকে বিভিন্ন ধমনির মাধ্যমে পাকস্থলী, অগ্ন্যাশয়, প্লিহা এবং অন্ত্রের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে। ওইসব অংশের জালক থেকে রক্ত পোর্টাল শিরার মধ্য দিয়ে যকৃতে অবস্থিত জালকে আসে। যকৃৎ থেকে রক্ত হেপাটিক শিরার মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে। মানবদেহে কেবল হেপাটিক পোর্টালতন্ত্র বিদ্যমান।

☑ **সিস্টেমিক শিরা :** যেসব শিরা দেহস্থ রক্তজালিকা থেকে উৎপন্ন হয়ে সরাসরি হৃৎপিণ্ডে মিলিত হয় তাদের সিস্টেমিক শিরা বলে। যেমন– উর্ধ্ব ও নিম্ন মহাশিরা।

☑ **পোর্টাল শিরা :** যেসব শিরা দেহস্থ রক্তজালক থেকে উৎপন্ন হয়ে হৃৎপিণ্ডে যাওয়ার পথে অন্য কোনো অঙ্গে পুনরায় জালক সৃষ্টি করে তাদের পোর্টাল শিরা বলে। যেমন– হেপাটিক পোর্টাল শিরা, রেনাল পোর্টাল শিরা।

☑ **ধমনিতন্ত্র :** মানবদেহের সর্বত্র বিস্তৃত ছোট-বড় বিভিন্ন ধমনি মিলে যে তন্ত্রের সৃষ্টি করে তাকে ধমনিতন্ত্র বলে।

☑ **শিরাতন্ত্র :** মানবদেহের সর্বত্র বিস্তৃত ছোট-বড় সকল শিরার সমন্বয়ে গঠিত জটিল তন্ত্রকে শিরাতন্ত্র বলে।

☑ **করোনারি ধমনি :** যে রক্তনালি দ্বারা হৃৎপিণ্ড নিজে রক্ত সরবরাহ পেয়ে থাকে তাকে করোনারি ধমনি বলে।

☑ **হৃদরোগ :** হৃৎপিণ্ড এবং হৃৎপিণ্ডের করোনারি ধমনি ও সংশ্লিষ্ট রক্তনালির কতিপয় সমস্যা বা রোগকে একত্রে হৃদরোগ বা হার্ট ডিজিজ বা কার্ডিওভাস্কুলার রোগ বা ইস্কিমিক হার্ট ডিজিজ বলা হয়।

CamScanner

☑ **অ্যানজাইনা :** করোনারি ধমনি সংক্রান্ত একটি অতি পরিচিত উপসর্গ। কোনো কারণে করোনারি ধমনির দ্বারা হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশিতে রক্ত সরবরাহ কমে গেলে বা সরবরাহের তুলনায় চাহিদা বেড়ে গেলে এক ধরনের ব্যথা অনুভূত হয়। এই ধরনের বুকের ব্যথাকে অ্যানজাইনা বলে।

☑ **অ্যার্টারিওস্ক্লেরোসিস :** যে প্রক্রিয়ায় ধমনি প্রাচীরে উচ্চমাত্রার কোলেস্টেরল জাতীয় হলদে চর্বি পদার্থ জমা হয়ে ধমনির প্রাচীর পুরু হয়ে শক্ত হতে শুরু করে তাকে আর্টারিওস্ক্লেরোসিস বলে। আর পুঞ্জীভূত কোলেস্টেরল জাতীয় পদার্থগুলোকে অ্যাথেরোমেটাস প্লাক বলে।

☑ **করোনারি হৃদরোগ :** অ্যাথেরোমেটাস প্লাকের জন্য ধমনির গহ্বর সরু হওয়ার ফলে হৃৎপেশিতে পর্যাপ্ত O_2 ও পুষ্টি সরবরাহ বাধাগ্রস্ত হওয়ায় যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে করোনারি হৃদরোগ বা ইস্কিমিয়া বলে। অ্যানজাইনা, হার্ট অ্যাটাক, হার্ট ফেইলিউর ইত্যাদি করোনারি হৃৎরোগ। করোনারি ধমনির অস্বাভাবিকতার জন্য এই রোগগুলো সৃষ্টি হয়।

☑ **হার্ট ব্লক :** হৃৎপিণ্ডের সংকোচনের উদ্দীপনা সৃষ্টি না হওয়া অথবা উদ্দীপনা পরিবহনের ত্রুটিজনিত রোগ।

☑ **হার্ট অ্যাটাক বা মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্রাকশন :** হৃৎপিণ্ডের কোনো অংশে দীর্ঘ সময় ব্যাপী রক্ত সরবরাহ বন্ধ থাকলে ঐ অংশের পেশিগুলো অকেজো হয়ে কিংবা মরে গিয়ে যে সমস্যা সৃষ্টি করে তাকেই হার্ট অ্যাটাক বা মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্রাকশন বলে। হার্ট অ্যাটাকের ফলে রোগী সাধারণত অজ্ঞান হয় না কিংবা দেহের একদিকে প্যারালাইজড (paralized) হয় না।

☑ **হার্ট ফেইলিউর :** হৃৎপিণ্ড যখন দক্ষতার সঙ্গে দেহে রক্ত সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয় তখন তাকে হার্ট ফেইলিউর বলে।

☑ **স্ট্রোক :** উচ্চ রক্তচাপের জন্য রক্তবাহ বিদীর্ণ হওয়ার ফলে (রক্তক্ষরণের ফলে) অথবা দুর্ঘটনায় বিদীর্ণ কিংবা মস্তিষ্কে রক্তবাহের অবরোধের ফলে স্ট্রোক হয়। মস্তিষ্কের স্নায়ু কোষগুলো পুষ্টি ও অক্সিজেনের অভাবে দেহাংশে পক্ষাঘাত দেখা যায়। অর্থাৎ এর ফলে সাধারণত রোগী অজ্ঞান হয়ে যায় কিংবা দেহের একদিকে প্যারালাইজড হয়ে যায়।

☑ **কার্ডিওলজিস্ট :** হৃৎপিণ্ড ও রক্তনালি সম্পর্কিত বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত চিকিৎসককে কার্ডিওলজিস্ট (Cardiologist) বলে।

☑ **পেসমেকার :** হৃৎপিণ্ডের ডান অ্যাট্রিয়ামে সাইনো অ্যাট্রিয়াল নোড (Sino Atrial Node-SAN) নামক বিশেষ ধরনের সংযোজী টিস্যু থেকে বৈদ্যুতিক সংকেত সৃষ্টি হয়ে সমগ্র হৃৎপিণ্ডে ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে হৃৎস্পন্দন শুরু হয় এবং স্পন্দন ছন্দময়তা বজায় থাকে। তাই SAN-কে পেসমেকার বলে। একে ছন্দনিয়ামকও বলা হয়।

☑ **কৃত্রিম পেসমেকার :** কৃত্রিম পেসমেকার একটি বিশেষ ধরনের যন্ত্র, যা একটি লিথিয়াম ব্যাটারি, কম্পিউটারাইজড জেনারেটর ও শীর্ষে সেন্সরযুক্ত কতকগুলো তার বা লিড (lead) নিয়ে গঠিত। দেহের SAN বা পেসমেকার কাজ না করলে হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে কৃত্রিম পেসমেকার স্থাপন করে হার্টবিট বা হৃৎস্পন্দন স্বাভাবিক করা যায়। অথবা, কৃত্রিম পেসমেকার হলো একটি বিশেষ ধরনের যন্ত্র যার মাধ্যমে মানুষের অনিয়ন্ত্রিত হার্টবিট নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। এ যন্ত্র হতে নিম্ন মাত্রার বৈদ্যুতিক সংকেত সৃষ্টি হয়ে হার্টবিটের সূচনা করে।

☑ **অ্যারিথমিয়া :** কোনো কারণে প্রাকৃতিক পেসমেকারে (SAN) কাজ না করলে বা বিকল হলে একটি স্পন্দন প্রবাহ উৎপন্ন করতে ব্যর্থ হয়, তখন হৃৎস্পন্দন অনিয়মিত হয়। এ অবস্থাকে বলা হয় অ্যারিথমিয়া (arrhythmia)। অথবা- হৃৎস্পন্দন স্বাভাবিকের চেয়ে মন্থর বা দ্রুত গতিসম্পন্ন কিংবা অনিয়মিত হলে অর্থাৎ অস্বাভাবিক হৃৎস্পন্দন হলে তাকে অ্যারিথমিয়া বলে।

☑ **ব্রাডিকার্ডিয়া :** হৃৎস্পন্দনের হার অস্বাভাবিক কমে যাওয়াকে (প্রতি মিনিটে 60 বা তারও কম) ব্রাডিকার্ডিয়া (bradycardia) বলে।

☑ **টাকিকার্ডিয়া :** হৃৎস্পন্দনের হার অস্বাভাবিক বেড়ে যাওয়াকে (প্রতি মিনিটে 100-200 বার) টাকিকার্ডিয়া বলে।

☑ **এনজিওগ্রাম :** উরু ও পেটের সংযোগস্থলে কুঁচকিতে স্থানীয়ভাবে অবশ করে সুচ ঢোকানোর পর এক ধরনের ইনজেকশন পুশ করে ছবি নেওয়ার মাধ্যমে ব্লক নির্ণয়ের পদ্ধতিকে এনজিওগ্রাম বলে।

☑ **থ্রম্বোলাইটিক থেরাপি :** রক্তনালিকার ভেতরের রক্ত জমাট ভাঙ্গতে রোগীকে ওষুধ সেবন করার পরামর্শ দেওয়া হয়। বুকে ব্যথা অনুভূত হওয়ার ৩ ঘন্টার মধ্যে এ ধরনের ওষুধ সেবন করতে হয়। এ চিকিৎসাকে থ্রম্বোলাইটিক থেরাপি (thrombolytic therapy) বলে।

☑ **ওপেন হার্ট সার্জারি :** চিকিৎসকরা যখন বক্ষের অস্থিকে কেটে হৃৎপিণ্ডকে উন্মুক্ত করেন এবং হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন কমিয়ে অপারেশনের মাধ্যমে হার্টের সমস্যাগুলো দূরীভূত করেন তাকে ওপেন হার্ট সার্জারি বলে।

☑ **করোনারি বাইপাস :** করোনারি ধমনির ভেতরে ব্লক তৈরি হয়ে যদি হৃৎপেশিতে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যায় কিংবা বাধাগ্রস্ত হয় তবে উক্ত রক্ত বিকল্প আরেকটি পথে হৃৎপেশিতে পৌঁছানোর পদ্ধতিকে করোনারি বাইপাস বা সিএবিজি (Coronary Artery Bypass Graft/Grafting -CABG) বলে।

☑ **অ্যাথারোমা :** যে কারণে করোনারি ধমনি সরু হয়ে যায় তাকে অ্যাথারোমা (atheroma) বলে। অথবা, চর্বি জাতীয় পদার্থ, ক্যালসিয়াম, প্রোটিন প্রভৃতি করোনারি ধমনির অন্তর্গাত্রে জমা হয়ে বিভিন্ন আকৃতির প্লাক (plaques) গঠন করে। একে অ্যাথারোমা বা করোনারি অ্যাথারোমা (atheroma/coronary atheroma) বলে।

☑ **ক্যাথেটার :** ক্যাথেটার হলো একটি নমনীয়, লম্বা ও সরু টিউব বিশেষ যার দ্বারা করোনারি ধমনির সরু হয়ে যাওয়া অংশে একটি করোনারি স্টেন্ট (coronary stent) বা রিং স্থাপন করা হয়। এটি যান্ত্রিক পেসমেকার ও এনজিওপ্লাস্টিতে ব্যবহার করা হয়।

☑ **এনজিওপ্লাস্টি :** এনজিওপ্লাস্টি হচ্ছে এক ধরনের চিকিৎসা, যার সাহায্যে ধমনির যে অংশে কোলেস্টেরল জমে ব্লকেজ ও রক্ত চলাচলে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়, সে জায়গাটিকে প্রসারিত করা। এনজিওপ্লাস্টির ফলে করোনারি ধমনি দিয়ে স্বাভাবিক রক্তপ্রবাহ ঘটে এবং হৃৎপিণ্ড সচল থাকে।

CamScanner